সূচীপত্র

হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ)–র সংক্ষিপ্ত পরিচয়

ইমাম গাজ্জালী ছিলেন একাধারে সত্যিকার অর্থে আলেম, আধ্যাত্মিক সাধক এবং একজন সুবিজ্ঞ গ্রন্থকার। তা'ছাড়া তিনি এক নিষ্ঠাবান সংস্কারকও ছিলেন। তিনি গাজ্জালী নামেই খ্যাত।

নামকরণ ও জন্ম তারিখ

ইমাম গাজ্জালীর আসল নাম মুহাম্মাদ আবূ হামেদ। গাজ্জালী উপাধি এবং ওরফী নাম। জয়নুদ্দীন তাঁর উপনাম। অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে তুসের 'গাজ্জাল' নামানুসারে তাঁর 'গাজ্জালী' নামকরণ করা হয়েছে। তবে প্রকৃত কথা এই যে, 'গাজ্জাল' থেকেই তিনি গাজ্জালী নামে খ্যাত হন। এর অর্থ হলো সূতা কাটা। তাঁর পিতা উন্ কাটতেন এবং তার তেজারত করতেন। এ কারণে তাঁকে গাজ্জালী বলা হতো।

ইমাম গাজ্জালী খোরাসান জেলার অন্তর্গত তুসের তাহেরায় ৪৫০ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার অন্তিমকালে তিনি তাঁর দুই পুত্র মুহাম্মদ গাজ্জালী ও আহাম্মদ গাজ্জালীকে শিক্ষা–দীক্ষা দানের উদ্দেশ্যে এক বন্ধুর হাতে সোপর্দ করে যান।

শিক্ষা–দীক্ষা

পৈতৃক পুঁজি ফুরিয়ে গেলে পিতার সেই ধার্মিক বন্ধুও আর্থিক অনটনের কারণে ইমাম গাজ্জালীকে এক মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। সেখানে শিক্ষার্থীদের জন্য খাওয়া–পরারও ব্যবস্থা ছিল। ইমাম গাজ্জালী তাঁর শিক্ষাজীবনের কথা প্রসঙ্গে বলেনঃ আমি পার্থিব উদ্দেশ্যে এবং জীবিকার জন্যই ইল্‌ম শিক্ষা শুরু করেছিলাম; কিন্তু দেখা গেল, ইল্‌ম সেভাবে অর্জিত হবার নয়, বরং একমাত্র আল্লাহ্‌র জন্যই ইল্‌ম অর্জিত হতে পারে।

আজকের ন্যায় তখনকার দিনে স্কুল–মাদ্রাসা ছিল না। শিক্ষার্থীগণ মসজিদ এবং খানকাগুলোতে ইল্‌ম শিক্ষা করতেন।

ইমাম গাজ্জালী নিজ দেশের আহাম্মদ বিন মুহাম্মদ রাযকানী নামক এক বিজ্ঞ আলেমের কাছে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। এর পর তিনি জুরজানের বিখ্যাত আলেম আবু নসর ইসমাইলের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। ওস্তাদের নিকট থেকে বক্তৃতাগুলো শিক্ষার্থীগণ নোট করে নিতেন। সেকালে শিক্ষার এই রীতি ছিল। এরপরে তিনি তৎকালীন প্রসিদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র নিশাপুর চলে যান। সেখানে তিনি প্রসিদ্ধ আলেম আবদুল মালেক জিয়াউদ্দিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জিয়াউদ্দিন ছিলেন একজন উচ্চ শ্রেণীর বিদ্বান পণ্ডিত। তাঁর কাছে শিক্ষা অর্জনের পর গাজ্জালী বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং বড় বড় জ্ঞানীর সভায় জ্ঞানমূলক বিতর্কে জয়লাভ করতে থাকেন।

তুসের নিজামুল মুলকের দরবারে এক সময় এক বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান হয়। সেখানে দূর–দূরান্ত থেকে খ্যাতনামা বিদ্বানগণ সমবেত হয়েছিলেন। এই সভায় ইমাম গাজ্জালীও উপস্থিত ছিলেন। বিতর্কে যিনি বিজয়ের মুকুট লাভ করেন, তিনি ছিলেন তরুণ বয়স্ক আলেম ইমাম গাজ্জালী। এই সাফল্য এবং বিজয় তাঁর খ্যাতি বহুগুণ বাড়িয়ে দিল।

ইমাম গাজ্জালীর শিক্ষা জীবনের একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা। তিনি এক সময় নিজ পিতৃভূমি তুসে আসছিলেন। পথে কাফেলা ডাকাত কর্তৃক লুণ্ঠিত হলো। ইমাম গাজ্জালীর যা কিছু সম্বল ছিল, তাও লুট হয়ে যায়। ইমাম গাজ্জালী ওস্তাদগণের বক্তৃতার নোট খাতাগুলো লুণ্ঠিত হওয়ায় সর্বাপেক্ষা বেশী মর্মাহত হয়েছিলেন। তিনি ডাকাত সর্দারের কাছে গিয়ে সে কাগজগুলো ফেরত চাইলেন। ডাকাত হেসে বললো, "তবে কোন ছাই পড়েছ?" এই বলে ডাকাত কাগজগুলো ফেরত দিল।

কথাটা অবশ্য সামান্যই শুনতে; কিন্তু ইমামের মনে ডাকাতের কথাটি এমন দাগ কেটে গেল যে, তিনি জীবনে যা কিছু শিখতেন মুখস্থ করে রাখতেন।

হাদীস শিক্ষা

তৎকালীন প্রচলিত শিক্ষা সমাপ্তির পর তিনি হাদীস শিক্ষার প্রতি মনোনিবেশ করেন। তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য আল্লামা ইসমাইল হাফসী এবং হাফেজ ওমর বিন আবিল হাসান রুসানীকে নির্বাচিত করেন। এরা উভয়েই হাদীস শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

উপরোক্ত মুহাদ্দিসদ্বয়কে ইমাম সাহেব তুসে নিজ গৃহে স্থান দান করেন, তাঁদের সেবা করেন এবং হাদীস শাস্ত্রের প্রসিদ্ধ কিতাব বুখারী ও মুসলিম তাঁদের কাছে শিক্ষা লাভ করেন। এভাবে তিনি শেষ জীবনে হাদীস শাস্ত্রে জ্ঞান অর্জন করেন।

নিজামিয়া বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্তি

৪৮৪ হিজরী সনে ইমাম গাজ্জালী বিশেষ মর্যাদা সহকারে দারুল উলুম নিজামিয়ার প্রধান অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। তুসের শাসনকর্তা নিজামুল মূলক বহু অর্থ ব্যয়ে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। দারুল উলুম নিজামিয়ার প্রধান শিক্ষকের পদটি সামান্য কিছু ছিল না। উহার যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল, যেহেতু তৎকালীন শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ অনেকেই উক্ত পদটি অলংকৃত করেছিলেন। সুতরাং এই পদে বরিত হওয়া আর প্রধান অধ্যক্ষের পদ লাভ করা জ্ঞানীগণের দৃষ্টিতে ইমাম গাজ্জালীর একটা বিরাট সাফল্য হিসাবে গণ্য হলো।

অনেক দিন যাবত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত থেকে বিশেষ দক্ষতার সাথে শিক্ষা দান করেন। তাঁর কাছে শত শত শিক্ষার্থী শিক্ষা লাভ করেন। তাঁর শাগরিদগণের মধ্যে বহু গুণী–জ্ঞানী সৃষ্টি হয়।

ইমাম গাজ্জালী প্রথম জীবনে বিশেষ শান–শওকতের জীবন–যাপন করতেন। তিনি অত্যন্ত সৌখিন ও বিলাস প্রিয় ছিলেন–রেশমী পোশাক পরিধান করতেন। ইমাম জওজী বলেন, তিনি রেশমী স্বর্ণখচিত জামা–জুব্বাও পরিধান করতেন।

এই সময় হঠাৎ তাঁর মধ্যে আমূল পরিবর্তন এসে গেল। তিনি সংসারের সাথে সম্পর্ক বর্জন করে নির্জনতা অবলম্বন করলেন। জ্ঞান ও ধর্মীয় বিতর্কের প্রতি তাঁর বিরক্তি এসে গেল। তিনি আধ্যাত্মিক ধ্যান–ধারণা ও ধর্মীয় গবেষণায় গভীরভাবে লিপ্ত হলেন। পার্থিব জীবনের চাকচিক্য থেকে তাঁর মন ফিরে গেল। আহার–বিহার, পোশাক–পরিচ্ছদে তিনি লৌকিকতা বর্জন করলেন। একটি মাত্র কম্বলকেই তিনি সম্বল করলেন। মামুলী ধরনের খাদ্য, শাক–সব্জি খেয়ে তিনি দিন কাটাতে শুরু করে দিলেন। এভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক সাধকের রং–এ রূপান্তরিত হয়ে উঠল। তিনি নির্জনতার মধ্যে কৃচ্ছ্র সাধনায় অভ্যস্ত হলেন। এই অবস্থায় তিনি বু–আলী করোন্দীর নিকট তরিকার বায়আত গ্রহণ করেন।

নির্জনতা অবলম্বনকালীন একটি ঘটনা।

এক ব্যক্তি ইমাম গাজ্জালীকে মরুভূমির মধ্যে একটি কম্বল পরিহিত অবস্থায় একটি থলে হাতে নিয়ে উদাসীনতভাবে বিচরণ করতে দেখলেন। পরে তিনি সেই ইমাম গাজ্জালীকে অন্য সময় তাঁর তালীমের হালকায় চার শতাধিক শিক্ষার্থী পরিবেষ্টিত অবস্থায় দেখলেন। লোকটি তাঁকে এ অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলো–"পূর্বের চেয়ে এ অবস্থা কি উত্তম?" তিনি দু'লাইন কবিতার মাধ্যমে জবাব দিলেন। তার মর্মার্থ এইঃ

লাইলা আর সুদার প্রেম তো ঘরেই বর্জন করেছি; এবার আমি সত্যিকারের মাহ্বুব আর সর্বশ্রেষ্ঠ বন্ধুর খোঁজে বেরিয়েছি। প্রেম আমাকে ডাকছে–"হে মরুচারী। কোথায় যাও, এদিকে এস, এখানে তোমার প্রিয়তমের আস্তানা, এবার তুমি ভ্রমণ বন্ধ কর।"

সংসার বৈরাগ্যের কারণ

জ্ঞান শিক্ষা দান, ধর্মীয় বিতর্ক ও আলোচনা এবং ওয়াজ–নসীহতের ন্যায় পবিত্র মজলিস অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করে কেন তিনি নির্জনতা অবলম্বন করলেন, কিসের প্রেরণায় তিনি এই পথ অবলম্বন করেছিলেন? ঐতিহাসিকগণ এ সম্পর্কে তাঁর ভাই আহাম্মদ গাজ্জালীর একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। এক সময় ইমাম গাজ্জালী এক সভায় ওয়াজ করছিলেন। সহস্র সহস্র আলেম, বিদ্বান ও বিশিষ্ট আমীর ওমরাহ্ মজলিসে উপস্থিত ছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তার ভাই আহাম্মদ গাজ্জালী এসে উপস্থিত হলে তিনি দু'লাইন কবিতা পাঠ করলেন, যার মর্মার্থ এইঃ

তুমি অন্যকে হেদায়েত করছ অথছ তুমি নিজে তা পালন করছ না, অন্যকে উপদেশ দিচ্ছ অথচ তুমি তার অনুসারী নও, হে প্রস্তরখণ্ড; কত দিন তুমি আর অস্ত্র শান দেবে অথচ কাটবে না।

ইমামের প্রতি এই দু'লাইন কবিতার এমনই প্রতিক্রিয়া হলো যে, তিনি জীবনে আর কখনও ওয়াজ করেন নি। আত্মশুদ্ধিতে তিনি এভাবে নিমজ্জিত হলেন যে, পার্থিব জীবন থেকে তিনি একেবারে বিমুখ হলেন। অতঃপর সারা জীবন তিনি আধ্যাত্মিক সাধনার ভিতর দিয়ে অতিবাহিত করেন।

ঐতিহাসিক আল্লামা শিবলী উপরোক্ত কারণকেই তাঁর সংসার বিসর্জনের উপলক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ইমাম গাজ্জালী তাঁর লিখিত 'আলমুনকায মিনাদ্দালাল' গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেনঃ

"আমি জ্ঞান শিক্ষার পর যখন সুফী সাধকগণের পথের প্রতি অগ্রসর হলাম, তখন দেখতে পেলাম যে আধ্যাত্মিক সাধনা দ্বারাই এ পথের সাফল্য লাভ করা যায়। এই জ্ঞানের সাহায্যেই পার্থিব বাসনা প্রবৃত্তির কামনা থেকে উদ্ধার পাওয়া যেতে পারে। এই জ্ঞানের সাহায্যে অন্তরকে দুনিয়াদারী হতে পাক–সাফ করা এবং আল্লাহ্র যিকিরের নূরে আলোকিত করা সম্ভব।"

ইমাম গাজ্জালী তাঁর এই আধ্যাত্মিক জীবনধারার প্রতি এতই আকৃষ্ট ছিলেন যে, এর তুলনায় তিনি তাঁর অতীত জীবনকে মূর্খতা ও অন্ধকার জীবন বলে মনে করতেন। ইমাম গাজ্জালী যখন মাঠে–ময়দানে ঘুরে বেড়াতেন, তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি কোন বিষয়ে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি তার উত্তরে বললেন–"চলে যাও, এ তো সেই বাতিল জীবনকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছ, যখন ফতোয়া দেওয়ার কাজ করতাম, তখন যদি আমার কাছে এ পশ্ন করতে উত্তর দেওয়া যেত।"

ইমাম গাজ্জালীর উপরোক্ত জবাবের দ্বারা অনুমান করা যায় যে, তিনি আধ্যাত্মিক জগতের এত উচ্চস্তরে উন্নীত হয়েছিলেন যে, তিনি বাহ্যিক ইল্ম শিক্ষা, চর্চা ও ফতোয়া লেখার জীবনকে নিষ্ফল ও ব্যস্ততার জীবন বলে গণ্য করতেন।

জুননুন মিসরী (রহঃ) সম্ভবতঃ এসব পূতঃ চরিত্র সাধকদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

هُمْ قَوْمٌ اٰثَرُوا اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ-

অর্থাৎ এরা হচ্ছেন সেই লোক যাঁরা দুনিয়ার সব কিছুর উপর আল্লাহ্কে স্থান দেন। আর তাঁরা হয়ে যান আল্লাহ্র একান্ত প্রিয়। বস্তুতঃ মানুষ যখন সাধনার স্তরে পৌছে তখন তাদের একমাত্র মাহ্বুব ছাড়া জীবনে আর কোন কিছুই উদ্দেশ্য থাকে না।

কবিতা চর্চা

ইমাম গাজ্জালী কবিতাও চর্চা করতেন। তবে তা রুবাইয়াত পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কাসীদা, স্তুতি বা তোষামোদমূলক কবিতা তিনি লিখতেন না, যেহেতু তার স্বাধীন প্রকৃতির পক্ষে তা বাঞ্ছনীয় ছিল না। এ কারণে তিনি কখনও কারো জন্য কাসীদা লেখেন নি।

গ্রন্থ রচনা

যদিও তাঁর আধ্যাত্মিক সাধনার যুগে দুনিয়ার সব কাজই বর্জন করেছিলেন— তা সত্ত্বেও এই নির্জনতার জীবনে গ্রন্থাদি রচনার কাজ অব্যাহত ছিল। বিভিন্ন জ্ঞান ও শাস্ত্রে তাঁর বিস্তর গ্রন্থ দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষ করে কালাম শাস্ত্র আর আখলাক বা নীতিশাস্ত্রের উপর তার ব্যাপক রচনা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে কয়েকখানির নাম নিম্নে উললেখ করা গেলঃ

ইহ্ইয়ায়ে উলুম, কিমিয়া-ই-সায়াদাত, জওয়াহিরুল কুরআন, তাহাফাতুল ফালাসিফা, হাকীকাতুর রূহ্, আজাইবুল মাখলুকাত (আল হিকমাতু ফী মাখলুকাতিল্লাহ্), ইয়াকুত্তাবীল ফীত্তাফসীর, মিন্হাজুল আবেদীন, তালীমুদ্দিনে *কাশফু উলুমিল আখেরাত প্রভৃতি গ্রন্থ দেখে অবাক হতে হয়। তার মাত্র ৫৫* বৎসরের সংক্ষিপ্ত জীবন যার মধ্যে তার সংসার ত্যাগ আধ্যাত্মিক সাধনার জীবনও রয়েছে, রয়েছে তার শৈশব ও শিক্ষা জীবন, আরও রয়েছে নানা বিপদ আপদে জর্জরিত জীবন—এর মধ্যে এত অধিক সংখ্যক গ্রন্থ রচনা সহজসাধ্য ছিল না।

ওফাত

হায়! জ্ঞান ও মনীষার এই উজ্জ্বল সূর্য মাত্র ৫৫ বৎসর বয়সে ৫০৫ হিজরী সনে নিজ জন্মভূমি তাহেরায় চিরদিনের জন্য অস্তমিত হলেন। তবে তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী আজও অম্লান এবং কেয়ামত পর্যন্ত তা বিলুপ্ত হবার নয়। সফীনাতুল আওলিয়ার গ্রন্থকার ইমাম গাজ্জালীর সমাধি বাগদাদে বলে লিখেছেন।

ইবনে জওযী ইমাম গাজ্জালীর মৃত্যু প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ৫০৫ হিজরীর ১৪ই জামাদিউস্সানী—১১১১ খ্রীঃ ১৮ই ডিসেম্বর ভোরে স্বাভাবিকভাবে

জাগ্রত হন এবং অজু করে নামায আদায় করার পর তিনি নিজ কাফন চেয়ে নিয়ে চোখে লাগালেন, আর বললেন—"আল্লাহ্র হুকুম শিরোধার্য।" এই বলে তিনি অন্তিম শয্যায় শয়ন করলেন। আর তিনি কখনও উঠেন নি।

রফত আঁ তাউস-ই আরশী
সুয়ে আরশ
চুঁরসীদ আস হাতিফানশ
বুয়েআরশ।।

মুহাম্মদ আলী
লুত্ফী,
১৯৫৬

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

মুকাদ্দমা

সকল প্রশংসা সেই একক আল্লাহ্‌র, যিনি আল্লাহ্‌র নৈকট্যপ্রাপ্ত লোকগণকে বিশেষ অনুগ্রহে ভূষিত করেছেন; সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা গবেষণাকারীদের প্রতিও করেছেন বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া—আর বিশ্বের সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে চিন্তা ভাবনাকে তিনি ঈমান ও ইয়াকীনের দৃঢ়তার উপলক্ষ করেছেন। এসব চিন্তা গবেষণাকারীগণ এভাবে তাঁদের সৃষ্টিকর্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছেন। আর তিনি যে এক এবং অদ্বিতীয় সে সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস অর্জন করেছেন। তারা আল্লাহ্‌র অপার মহিমা ও কুদরত প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি যে সকল দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে পেরেছেন। তিনি নিঃসন্দেহে আদল-ইন্‌সাফের সাথে বিদ্যমান, আর চিন্তাশীল গবেষণাকারীগণ তাঁর কামালতের সাক্ষী। তাঁরা নিশ্চিতভাবে জানেন যে, তিনিই একমাত্র সর্বশক্তির আধার, যেমন তিনি তাঁর কিতাবে মুবীনে উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ্ আর তাঁর ফেরেশতাগণ সাক্ষী যে, একমাত্র সেই একক সত্তা ব্যতীত ইবাদতের আর কেউ লায়েক নেই। তিনিই একমাত্র আদল-ইন্‌সাফের মালিক। তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর, আর সব কিছুতে এবং সব কাজে রয়েছে কৌশল ও কল্যাণ। আর দরূদ ও সালাম তাঁর প্রতি যিনি নবীগণের সরদার, মুত্তাকীগণের ইমাম আর আমাদের ন্যায় গুনাহগারদের ফরিয়াদ শ্রবণকারী, যাঁর পবিত্র নাম মুহাম্মদ (সঃ), যিনি সর্বশেষ নবী আর সালাত ও সালাম তাঁর আল্ ও আসহাবগণের প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত।

অতঃপর হে ভ্রাতঃ! আল্লাহ্ তোমাকে প্রকৃত সত্য উপলব্ধির সুযোগ দিন। আর দান করুন দ্বীন ও দুনিয়ার কল্যাণ।

আল্লাহ্‌র পরমাশ্চর্য সৃষ্টির নৈপুণ্য রহস্যের প্রতি চিন্তা করা ছাড়া তাঁকে জানা ও চেনা সম্ভব নয়। বস্তুতঃ এ-ই হচ্ছে ঈমান ও ইয়াকীনের প্রমাণ আর দৃঢ়তার

উপলক্ষ। আর এরই কারণে মুমিনের দরজা ও মরতবার মধ্যে তারতম্য। কেননা, প্রকৃত মা'রেফাত অর্জন সৃষ্টি রহস্যের প্রতি চিন্তা–ভাবনার উপরই নির্ভরশীল। এ কারণে এই গ্রন্থখানি জ্ঞানীবৃন্দের পথ প্রদর্শন আর উপদেশের জন্য লিখিত হয়েছে। কুরআনে কারীমে বিভিন্ন স্থানে যে বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব রহস্য ও তাৎপর্যই এতে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান দান করেছেন। আল্লাহ্র ওহী সে জ্ঞানকে পরিচালিত করেছে, চিন্তাশীল জ্ঞানী লোকদেরকে আল্লাহ্ তাঁর সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি তাদের শক্তি অনুসারে চিন্তা করার আহবান দিয়েছেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

قُلِ انْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ -

হে মুহাম্মদ (সঃ), আপনি লোকদেরকে বলে দিন যে, তোমরা আসমান জমীনে যা কিছু আছে সে বিষয়ে চিন্তা কর। (সূরা তওবা)

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ -

'আর আমি পানি দ্বারা সব জীবিত জিনিস পয়দা করেছি। সুতরাং এখনও কি তারা ঈমান আনিবে না?' (সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৩০)

এমনি আরো বহু আয়াত রয়েছে, যার অর্থের প্রতি চিন্তা–ভাবনা করলে আল্লাহ্র মারেফত আর তাঁর অপার মহিমা সম্পর্কে জ্ঞান জন্মে। আর এটাই হচ্ছে প্রকৃত সৌভাগ্য ও কল্যাণ লাভের উপলক্ষ, যার উপর আল্লাহ্র ইনআম ও পুরস্কার নির্ভরশীল।

এই গ্রন্থে কতগুলো অধ্যায় সংযোজিত হয়েছে। প্রতি অধ্যায়ে আল্লাহ্র কুদরত যথাসম্ভব বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। আল্লাহ্র সৃষ্টির রহস্য এতই গভীর এবং তাৎপর্যপূর্ণ যে, দুনিয়ার সারা সৃষ্টি তার সকল শক্তি ব্যয় করেও কোন একটি সৃষ্টির পূর্ণ রহস্য উদঘাটন করার যদি চেষ্টা করে তা' কখনও পূর্ণরূপে সম্ভব হবে না, বরং সকলেই এ বিষয়ে অসমর্থ হবে।

জমিন ও আসমানের সৃষ্টি পদার্থের প্রতি চিন্তা করার আহবান

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا

وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ -

লোকগণ কি আসমানের দিকে তাকিয়ে দেখে না? আমি আসমানকে কত উচ্চ করে নির্মাণ করেছি আর তাকে নক্ষত্ররাজি দ্বারা সজ্জিত করেছি আর এতে কোন ছিদ্র নেই। (সূরা কাফঃ আয়াত ৬)

اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ -

আর আল্লাহ্ই সপ্ত আসমান সৃষ্টি করেছেন। (সূরা বাকারা)

তুমি আসমানের প্রতি লক্ষ্য করে দেখলে মনে হবে এই সারা জাহান একটি গৃহ, যেখানে আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু মজুদ রয়েছে। আসমান ছাদস্বরূপ আর জমিন আমাদের বিছানা। আকাশকে আলোকিত রাখার জন্য আসমানের তারাগুলো আমাদের বিজলী বাতির স্থলবর্তী। আর মাটির গর্ভে খনিজ সম্পদ এভাবে সঞ্চিত রয়েছে যেন মূল্যবান সামগ্রী সংরক্ষিত করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জিনিসই স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত। এই গৃহের মালিক মানুষ, আর এই গৃহের যাবতীয় আসবাবপত্র সবই মানুষের। গৃহের মালিকের প্রয়োজনে সংগৃহীত। কি উদ্ভিদ, কি জীবজগত সবই নিজ নিজ কর্মে ব্যস্ত।

আল্লাহ্ আসমানের রং এমন সৃষ্টি করেছেন, যা' দৃষ্টির পক্ষে উপযোগী এবং শান্তিদায়ক। যদি আসমান উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত হতো তবে চক্ষুকে ঝলসিয়ে দিত। নীল বর্ণ দৃষ্টির পক্ষে পছন্দসই ও আকর্ষণীয়। মানুষ যখন বিশাল আসমানের সীমাহীন প্রসারতা দেখে তখন তার মন আনন্দিত ও উল্লসিত হয়ে উঠে—বিশেষ করে আসমানে নক্ষত্ররাজি যখন পূর্ণভাবে ফুটে উঠে। চন্দ্র তার উজ্জ্বল আলোকে আলোকিত করে সারা দুনিয়া। দুনিয়ার বড় বড় বাদশাহ্ নিজ নিজ শাহী মহলগুলোকে সজ্জিত করার জন্য উত্তম হতে উত্তম জিনিসগুলো সংগ্রহ করে। নিজ দরবারের ছাদ সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত করে। দেখে নয়ন মুগ্ধ হয় আর মন আনন্দিত হয়। কিন্তু এগুলোর প্রতি কয়েকবার দৃষ্টিপাত করার পর এতে কোন আকর্ষণ থাকে না। আপনা থেকে বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়। কিন্তু আল্লাহ্র সৃষ্টি আসমানের বেলায় এর বিপরীত। এর প্রাকৃতিক শোভা সৌন্দর্য, এর সীমাহীন বিশালতা এবং নক্ষত্ররাজির চাকচিক্যের প্রতি যতই তাকান হউক না কেন, কখনও বিতৃষ্ণা আসবে না, বরং সৃষ্টির রকমারি কারুকার্য, আর নৈপুণ্যের

প্রতি দৃষ্টিপাত করলে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের ছাপ হৃদয়ে অংকিত হবে। তখন অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনা আপনি উচ্চারিত হবে—

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا۔

হে আল্লাহ্! তুমি এসব অনর্থকই সৃষ্টি কর নি।

(সূরা আলে–ইমরানঃ আয়াত ১৯১)

এইজন্যই জ্ঞানীগণ বলেছেন যে, যখন তোমার অন্তর দুঃখ–বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়, তখন তুমি আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত কর, আল্লাহ্‌র অপার কুদরতের নিদর্শনগুলো দেখ, এতে অন্তরের দুঃখ উপশম করার যথেষ্ট উপকরণ বিদ্যমান রয়েছে। নক্ষত্রগুলোর প্রতি দৃষ্টি কর, তারপর এর উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য কর, মানুষ এগুলো দ্বারা কিভাবে উপকৃত হচ্ছে। সমুদ্রে অন্ধকার রাত্রিতে এই নক্ষত্রগুলো সমুদ্রযাত্রীদের দিক নির্দেশ করে। কোন কোন বিজ্ঞানী স্বীকার করেন যে, তারকার যাতায়াতের পথ সৃষ্টি হয়েছে এবং এক তারকার অধিবাসী অন্য তারকায় যাতায়াত করে থাকে। কোন বিজ্ঞানী বলেছেন, আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত করার মধ্যে নিম্ন বর্ণিত উপকারিতা রয়েছে—

১। মানুষের মানসিক কষ্ট দূর হয়;
২। মনের কু–ধারণা দূরীভূত হয়;
৩। মন থেকে ভয়–ভীতি দূর হয়;
৪। আল্লাহ্‌র স্মরণ জীবন্ত হয়;
৫। অন্তরে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য উপলব্ধি হয়;
৬। ভ্রান্ত ধারণা দূর হয়;
৭। রোগ বিশেষের উপকার হয়;
৮। চঞ্চল মনে স্থিরতা ও সান্ত্বনা আসে;
৯। প্রার্থনাকারীদেরকিবলা।

সূর্য সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا۔

আল্লাহ্ সূর্যকে একটি সমুজ্জ্বল প্রদীপ করে সৃষ্টি করেছেন।

(সূরা নূহঃ আয়াত ১৬)

আল্লাহ্ যে উদ্দেশ্যে সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন, তার পুরোপুরি রহস্য তো এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো জানা নেই। আমরা আমাদের শক্তি, সাধ্য ও গবেষণা দ্বারা যা কিছু জানতে পেরেছি, তা এখানে উল্লেখ করছি।

সূর্যের আবর্তনে দিন রাতের সৃষ্টি হয়। যদি তা না হতো তাতে দিনের বহু কাজই বিপর্যস্ত হতো। আর সাংসারিক কাজ কর্মও করা সম্ভব হতো না। জীবিকা উপার্জন কঠিন এবং দুঃসাধ্য হয়ে পড়তো। যদি সারা জগৎ শুধু অন্ধকারেই আচ্ছান্ন থাকত, তবে জগৎ আলোর স্বাদ হতে বঞ্চিত থাকতো আর কোন জিনিসের রং কি তাও জানা সম্ভব হতো না।

যদি সূর্যের আলো না হতো, তবে শরীর সুস্থ থাকতো না–খাদ্যদ্রব্য পরিপাক হতো না। তেমনি যদি সূর্য কখনো অস্ত না যেত আর কেবল একটানা দিনই থাকতো তাতেও নানা অসুবিধার সৃষ্টি হতো। রাত্রিতে লোক বিশ্রাম করে দিনের কর্ম ক্লান্তি দূর করে, দেহকে পুনঃ কাজের জন্য সুস্থ করে তোলে; যদি সূর্য অস্তই না যেত আর রাত্রি না হতো তবে লোভ ও স্বার্থের বশবর্তী হয়ে লোক কাজ করতে থাকতো। অন্য দিকে আরাম ও বিশ্রামের অভাবে শরীরে নতুন শক্তি সৃষ্টি হতে পারতো না এবং একটানা কাজ করে দেহ অকর্মণ্য ও অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তো। এতে শরীর পড়তো ভেঙ্গে আর যেতো বিকল হয়ে। এগুলোর কারণে রোগ–ব্যাধি অনিবার্য হয়ে পড়তো। তেমনি গৃহপালিত পশু যেগুলো সারাদিন কাজ করে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়ে, তারপর বিশ্রাম দেবার জন্য রাত্রে গোয়ালে বেঁধে রাখা হয় যাতে সারারাত বিশ্রাম গ্রহণ করে পরদিন পুনঃ কাজ করার উপযুক্ত হয়ে উঠে। রাত্রি না হলে একটানা কাজ করে করে

সেগুলোর অবস্থা অচিরেই শোচনীয় হয়ে পড়তো। সূর্য যদি একটানা অস্ত না যেত তবে পৃথিবীর মাটি উত্তপ্ত হয়ে পড়তো। পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষ আর পশু-পক্ষী সে উত্তাপে ধ্বংস হয়ে যেত। সুতরাং সূর্যের নিয়মিত উদয় আর অস্ত যাওয়া দুটোই বিজ্ঞানসম্মত আর কল্যাণকর। মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর শান্তি আর স্থিতি এরই মধ্যে নিহিত। মানুষ একটানা বিজলী বাতির আলোতে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, তখন বাতি নিভিয়ে দিয়ে শান্তি লাভ করে। আবার যখন একটানা অন্ধকারে মন বিষিয়ে উঠে তখন সেই বিচলিত মনকে স্বস্তি ও সান্ত্বনা দানের জন্য আলো জ্বেলে দেয়। মানুষ আগুনের সাহায্যে খাদ্য পাকায়, অন্যকে খানা পাকাতে সাহায্য করে, এমনকি একজন অপরজনকে সাহায্য করে। এমনি এই সৃষ্টির ধারা ও শৃংখলা বহাল রয়েছে। আলো আর আঁধার, তাপ আর শৈত্য উভয় মিলে আমাদের জীবন ধারণের পূর্ণ সাহায্য করে থাকে।

এরই প্রতি ইঙ্গিত করে আল্লাহ্ কুরআন করীমের একটি আয়াতে ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْ اَرَءَيْتُمْ اِنْ جَعَلَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الَّيْلَ سَرْمَدًا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ
مَنْ اِلٰهٌ غَيْرُ اللّٰهِ يَاْتِيْكُمْ بِضِيَآءٍ-

তুমি লোকদেরকে বলে দাও— (হে মুহাম্মদ সঃ) যদি আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি কেয়ামত পর্যন্ত অন্ধকার রাত করে দিতেন তবে কে ছিল তোমাদের এক আল্লাহ্ ছাড়া অন্য প্রভু, যে তোমাদের জন্য আলোর ব্যবস্থা করতো?

(সূরা কাসাসঃ আয়াত ৭)

যেমন সূর্যের উদয়-অস্তের মধ্যে গূঢ় রহস্য বিদ্যমান তেমনি তার উদয়-অস্তের অগ্র পশ্চাতে অর্থাৎ ঋতুর বিবর্তনের মধ্যেও বিরাট রহস্য নিহিত রয়েছে। সূর্যের উদয়-অস্তের স্থান ও কালের পরিবর্তনের মধ্যে উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের স্থিতি ও অস্তিত্বের বহু কিছু নির্ভরশীল রয়েছে। যথাসময়ে ফুল ফোটা, শস্য পাকা ইত্যাদি এই বিবর্তনের উপর নির্ভরশীল। ঋতুর বিবর্তনে রাত্রি দিনের ছোট বড় হওয়াও এই রহস্যের অন্তর্গত। যদি সূর্য একই নিয়মে বরাবর নির্দিষ্ট সময়ে উদয় হতে থাকতো তবে দিবারাত্রির এই হ্রাস বৃদ্ধি হতো না। মানুষের প্রকৃতিও ঠিক এমনি। সে সব সময় নতুনত্ব ও পরিবর্তন চায়। আর এর মধ্যেই সে শান্তি

লাভ করে। প্রবাদ আছে—প্রত্যেক নতুনত্বে রয়েছে স্বাদ। সময় নির্ধারণ আর সেই অনুসারে কাজগুলো নিয়ন্ত্রণ করা সূর্যের উদয়-অস্তের নিয়মেরই অধীন। দেখ! আল্লাহ্ রাতকে শান্তির ও বিশ্রামের অবকাশের আর দিনকে জীবিকা উপার্জনের জন্য কিভাবে সৃষ্টি করেছেন। তারপর ঋতুর বার্ষিক বিবর্তন, প্রতি মওসুমে আবহাওয়ার প্রভাব হচ্ছে এসবের মূল সূর্যের গতিবিধির প্রতিক্রিয়া। আবার আবহাওয়ার পরিবর্তনে তাপ ও শৈত্যের প্রভাব বৃক্ষাদি ও উদ্ভিদ আর তার ফল-ফুলের উপর পড়ে থাকে। সূর্যের উদয়-অস্ত ও মওসুমের বিবর্তনের ফলে মেঘ সৃষ্টি এবং যথাসময়ে বর্ষা হওয়াও এরই উপর নির্ভরশীল, যা মানব জগত আর উদ্ভিদ জগতের জীবন ধারণের উপলক্ষ। আর মানব প্রকৃতিতে পরিবর্তনও এই ঋতুর বিবর্তনের প্রভাবের অধীন। মানব প্রকৃতির উত্থান-পতন, আর ভারসাম্যের মূলে রয়েছে সূর্যের বিবর্তনের প্রতিক্রিয়া। মোটকথা, রোগ হওয়া, রোগ হতে রেহাই পাওয়া, শরীরে শক্তির সঞ্চার হওয়া, কর্মে পূর্ণ উদ্যম ও উৎসাহ সৃষ্টি হওয়া, এও সূর্যের আবর্তন এবং বিবর্তনের ফল। এসব স্ব স্ব ধারায় নির্দিষ্ট সময়ে একের পর এক ঘটে যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে অসংখ্য রহস্য আর কল্যাণ। সে সব দেখে শুনে, ভেবে চিন্তে সেই স্রষ্টার সৃষ্টি রহস্য আর তার নৈপুণ্যের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে হয়। তিনি তাঁর অসীম কুদরতে পরম নৈপুণ্যে এই বিশ্ব সংসার নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত করেছেন। মহা কল্যাণময় সেই সুনিপুণ স্রষ্টা।

পুনঃ সূর্যের কক্ষ পরিক্রমা, যার ফলে বার্ষিক গতি আবর্তিত হয়। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত প্রভৃতি ঋতুর আবির্ভাব এরই উপর নির্ভরশীল। এর দ্বারা বৎসর, মাস আর সপ্তাহের দিন গণনা এবং প্রতিটি জিনিসের বয়সের হিসাব এরই ফলশ্রুতি।

সূর্যকে বিশ্বের অতি উচ্চ স্থানে স্থাপন করার প্রতি লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ কি মহা কৌশলে একে উচ্চ স্থানে স্থাপন করেছেন। যদি সূর্য একই স্থানে স্থির থাকতো তবে তার ফলে পৃথিবীর এক অংশই কেবল উপকৃত হতো; আর অন্যান্য অংশ তার তাপ ও আলো থেকে বঞ্চিত থেকে যেত। সুতরাং সারা জাহানে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সমভাবে বিতরিত হতে পারতো না এবং আলো আর তাপ সর্বদা পৃথিবীর এক দিকে পড়তো। অপর অংশ তা থেকে চিরদিন বঞ্চিত থাকতো। এটা সৃষ্টিকর্তার অপূর্ব কৌশল যে তিনি সূর্যকে গতিশীল করেছেন— সূর্য উদয়ের পরে যে অংশে তার আলো আর তাপ বিকীর্ণ হয় অস্তের পরে সে অংশে ছায়া

এসে যায় এবং অন্ধকার অংশ আলোকিত হয় আর উত্তাপ লাভ করে। এভাবে সূর্যের আলো আর তাপ পৃথিবীর সর্বাংশে পতিত হয়।

এবার রাত্রি আর দিনের প্রতি লক্ষ্য কর। দিনের ও রাত্রির আবর্তন বিবর্তনের নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে সৃষ্টির বহু কল্যাণ নিহিত। সে নিয়মে যদি কিছুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটে তবে পৃথিবীতে বসবাসকারী প্রাণীগুলির প্রতি তার কম বেশী প্রভাব পড়বে। জীবন হোক বা উদ্ভিদ হোক কেউ সে প্রভাব থেকে বাঁচতে পারে না। যেমন প্রাণী যতক্ষণ দিনের আলোতে থাকবে ততক্ষণ সে কাজে নিয়োজিত থাকবে—এতে তার শক্তি হ্রাস পাবে। অথবা পশুগুলি মাঠে চড়তে থাকবে—তাতে উহার সীমার বাইরে চলে যাবে। যে কোন কাজ সীমার বাইরে চলে গেলে তার ধ্বংস অনিবার্য। আর উদ্ভিদ জগৎ দেখ, যদি অবিরাম অত্যধিক তাপ পায় তবে তা শুকিয়ে জ্বলে যাবে। এমনি যদি অবিরাম রাত থাকে তবে মানুষ এবং পশু সবারই জীবিকার বেলায় বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। প্রাকৃতিক উত্তাপ শীতল হয়ে পড়বে, এতে জীবজগত আর বৃক্ষ-লতাদি ধ্বংস হয়ে যাবে। তেমনি সূর্যের রশ্মি ও তাপের অভাব হলে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের অনুরূপ অবস্থা হবে।

চন্দ্র ও নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

تَبَارَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا وَّجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَّقَمَرًا مُّنِيْرًا ـ

সেই আল্লাহ্ মহা মহিমময়, যিনি আসমানে কক্ষপথ সৃষ্টি করেছেন আর বড় বড় নক্ষত্র ও উজ্জ্বল চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন। (সূরা ফুরকানঃ আয়াত ৬১)

মহা কৌশলময় আল্লাহ্ রাতকে শান্তি ও বিশ্রামের জন্য সৃষ্টি করেছেন; বায়ুকে শান্তিদায়ক আর শীতল করেছেন। তিনি রাতকে নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে রাখেন নি। কেননা রাত্রিকালে মানুষকে অনেক কাজ করতে হয়। সে কাজের জন্য মানুষ আলোর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। গ্রীষ্মেও উত্তাপের কারণে বা সময়ের সংকীর্ণতার জন্য অনেক সময় মানুষকে দিনের অসমাপ্ত কাজ বাড়ীতে সম্পন্ন করা দরকার হয়ে পড়ে, সে ক্ষেত্রে চাঁদের আলো তার বিশেষ কাজে আসে। কোন কোন রাত্রি চাঁদের স্নিগ্ধ আর মধুর জোছনা মানুষের মনকে আনন্দে ভরপুর করে তোলে। যে সব রাত্রিতে চাঁদ পূর্ণ কিরণ বিস্তার করে না সে রাত্রিতে তারকার মৃদু আলো চাঁদের অভাব অনেকখানি পূরণ করে! তা' ছাড়া চাঁদ আর নক্ষত্র দ্বারা আসমান আলোকে উদ্ভাসিত হয়। মানব সে মধুর দৃশ্য দেখে আত্মহারা হয়ে পড়ে। আল্লাহ্র এই সৃষ্টি নৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য কর, যিনি রাতের অন্ধকারে চাঁদ ও তারার স্নিগ্ধ আলোক দ্বারা অপসারিত করেন, যাতে মানুষ তার কাজকর্ম করতে সক্ষম হয়।

চাঁদের আবর্তন-বিবর্তনের সাথে বৎসর ও মাসের সম্পর্ক রয়েছে। এতে রয়েছে আল্লাহ্র নিপুণ রহস্য নিহিত।

তারাগুলিতে রশ্মি ছাড়াও আরো অনেক রহস্য রয়েছে। কৃষ্টি সম্পর্কিত অনেক কিছু চাঁদ ও নক্ষত্রের গতিবিধির সাথে সম্পর্কযুক্ত।

চাঁদ-তারা জলে-স্থলে ভ্রমণকারীদের জন্য বড় অবলম্বন। বিশাল বন বা মরুভূমিতে অন্ধকার রাত্রিতে ভ্রমণ, তেমনি অন্ধকার রাতের বেলায় সমুদ্রে ভ্রমণের সময় দিক নির্ণয় করা এসব নক্ষত্রের উপরই নির্ভর করে।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ النُّجُوْمَ لِتَهْتَدُوْا بِهَا فِىْ ظُلُمٰتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ-

সে আল্লাহ্ তারকাগুলি সৃষ্টি করেছেন যেন তোমরা জলে-স্থলে অন্ধকারে পথের নির্দেশ লাভ করতে পার। (সূরা আন'আমঃ আয়াত ৯৭ এর অংশ)

সূর্যের ন্যায় চাঁদের উদয়-অস্ত, গতিবিধি, তার প্রথম উদয়, তার হ্রাস-বৃদ্ধি আর কোন কোন রাত চন্দ্রহীন আর কোন সময় রাহু কবলিত হয়ে আলোকহীন হয়ে পড়ার মধ্যে আল্লাহ্র অসীম কুদরতের রহস্য নিহিত রয়েছে। কার সাধ্য তার হিসাব করে?

আর আসমানের সেই গতিশীল নক্ষত্রগুলির সাথে চাঁদের প্রতি রাত্রে দ্রুত গতিতে পরিভ্রমণ করা, যা আমরা নিজেরাও উদয়-অস্তের বেলায় লক্ষ্য করে থাকি, যদি তার গতি এরূপ দ্রুত না হতো তবে-রাত্রি-দিনের চব্বিশ ঘন্টায় সে এই দূরত্ব কিভাবে অতিক্রম করতো? আল্লাহ্ চাঁদকে অনেক উর্ধ্বে স্থাপন করেছেন যাতে আমরা তার দ্রুতগতি অনুভব করতে না পারি। আমাদের চোখের দৃষ্টিতে তার দ্রুতগতি দেখা গেলে আমাদের দৃষ্টি ঝল্সে যেত, আল্লাহ্ আকাশের বিজলী চমকে আমাদের চোখ যেমন ঝলসে যায়। আল্লাহ্র সে রহস্য থেকেও আমাদের এতটা দূরে রেখেছেন যে, যদি নিকটবর্তী হতো বা আমাদের অনুভব যোগ্য হতো তাতে হয়তো এমন কিছু ঘটনা ঘটতে পারতো, যা আমাদের পক্ষে ধারণা করা সম্ভব ছিল না। এ কারণে আল্লাহ্ চাঁদকে বিশেষ নিয়মে সৃষ্টি করেছেন।

সেসব নক্ষত্রগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, যেগুলি বৎসরে কোন কোন দিন অদৃশ্য থাকে। আবার কোন কোন দিন সেগুলি আকাশে দৃশ্যমান হয়। যেমনঃ সুরাইয়া, জুয়া, শুয়া প্রভৃতি। যদি এসব নক্ষত্র বরাবর আকাশে উদিত থাকত, তবে মানুষ সেগুলি দ্বারা এখন যে উপকার লাভ করছে তা লাভ হতো না। আর সেই মানুষের উপকার ও কল্যাণের জন্য সপ্তর্ষিমণ্ডল বা সাত-সিতারাকে আল্লাহ্

আসমানে দৃশ্যমান করে সৃষ্টি করেছেন। প্রতি রাত্রেই সে সাত-সিতারা মণ্ডলী আসমানে দেখা দেয়। ওরা যেন একটা নিদর্শন এবং নিশানা। অন্ধকার রাত্রিতে ভ্রমণকারীদের জন্য এ দ্বারা বিশেষ সাহায্য হয়ে থাকে।

এমনি যদি তারকাগুলি আসমানে স্থির হয়ে থাকত আর পরিভ্রমণ না করতো আর কক্ষপথ অতিক্রম না করতো তবে সেগুলির পরিক্রমার ফলে আমরা যেসব উপকার ও নির্দেশ লাভ করি সে সব থেকে বঞ্চিত থাকতে হত। ঠিক যেমন পৃথিবীতে ভ্রমণকারীগণ পথ পরিক্রমায় বিভিন্ন মঞ্জিল অতিক্রম করতে সাহায্য লাভ করে থাকে। আসমানের এসব ভ্রমণকারী নক্ষত্রগুলির প্রতি ঋতুতে পরিভ্রমণের মধ্যে প্রাণী ও উদ্ভিদ জগতের কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

এ হচ্ছে সৃষ্টিকর্তারই অপার মহিমা যে, তিনি আসমানকে সুউচ্চে স্থাপন করেছেন, সুদৃশ্য, সুদৃঢ় আর স্থায়ী করে নির্মাণ করেছেন যে, যুগ যুগ অতীত হওয়ার পরও তাতে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা, তার সামান্যতম পরিবর্তন পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য বিরাট বিপর্যয়ের কারণ হতে পারত, আর সৃষ্টির নিয়ম-শৃঙ্খলায় ব্যতিক্রম হতে পারত। স্রষ্টার এ হচ্ছে অসীম নৈপুণ্য যে, বিশ্ব সৃষ্টি একই নিয়মে ও শৃঙ্খলায় চলে আসছে।

দুনিয়া সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالْاَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُوْنَ -

আর এই দুনিয়াকে আমি বিছানা করেছি—আমি কত সুন্দর শয্যা রচনাকারী। (সূরা জারিয়াত)

আল্লাহ্ এই পৃথিবীকে একটি উত্তম শয্যারূপে সৃজন করেছেন। আমরা এই শয্যার উপর পরম নিশ্চিন্তে জীবন–যাপন করি। এ ছাড়া আমাদের জীবন–যাপন হতো কঠিন। তারপর এখানে আমাদের জীবন ধারণের সব উপায়–উপকরণ এবং পানাহারের দরকারী জিনিসের জন্য এই পৃথিবীই হচ্ছে ভাণ্ডার। আমাদের প্রয়োজনের সব–সামান এই পৃথিবীতেই রয়েছে। শীত–তাপ থেকে বাঁচবার ব্যবস্থাও আমরা এখান থেকে করতে পারি। দুর্গন্ধময় জিনিস আর মৃত–পচা দ্রব্যাদির দুর্গন্ধ থেকে বাঁচবার জন্য আমরা সেগুলিকে মাটির ভেতরে পুঁতে দিয়ে রক্ষা পেয়ে থাকি।

আল্লাহ্ বলেনঃ

اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ كِفَاتًا اَحْيَاءً وَّ اَمْوَاتًا -

আমি কি পৃথিবীতে জীবিত আর মৃতদেরকে ধারণ করার জন্য সৃষ্টি করিনি? (সূরা মুরসালাত)

পৃথিবীর বুকে আমাদের চলাফেরার জন্য পথ তৈয়ার করা হয়েছে, যাতে করে আমাদের জরুরী আসবাব, মাল–সামান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যেতে আর একে অন্যের প্রয়োজন মেটাতে পারি। আমাদের পশুদের খাদ্যও এই জমিন থেকে লাভ করি। জমিনেই হয় আমাদের কৃষি কাজ। এজন্য আমরা জমিনেরই মুখাপেক্ষী। আল্লাহ্ এ সম্পর্কে কুরআনের একটি আয়াতে আমাদের অবহিত করেছেনঃ

اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعٰهَا - وَالْجِبَالَ اَرْسٰهَا - مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِاَنْعَامِكُمْ -

জমিন থেকেই তাদের পানি আর খাদ্য বের করেছি, আর পর্বতগুলিকে প্রোথিত করেছি। এসব তোমাদের আর তোমাদের পশুগুলির কল্যাণের জন্য। (সূরা নাজিয়াতঃ আয়াত ৩১,৩২, ৩৩)

জমিনকে আল্লাহ্ কোমল আর আমাদের ব্যবহার উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। এর উপর আমরা বসি, শয্যা বিছাই আর এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করি। মাটিকে আমাদের প্রয়োজনের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে বলেই আমরা এসব সহজে করতে পারি। যদি জমিন অত্যধিক নরম হতো বা চঞ্চল হতো তবে আমরা এর উপর না ঘর–বাড়ী তৈয়ার করতে পারতাম, না কৃষি কাজ করতে পারতাম, না পারতাম এর উপর স্থির হয়ে থাকতে, আর না পারতাম আরাম–আয়েশ করতে। যেমন ভূমিকম্পের ঝট্‌কায় আমরা হয়ে পড়ি ভীত বিচলিত তার ভয়ে পারি না কোন কাজ করতে। আল্লাহ্‌র নীতি হচ্ছে এই—তিনি তার নাফরমান বান্দাদের সতর্ক করার জন্যে আর সৎপথে ফিরিয়ে আনার জন্য তিনি তাঁর শক্তি এভাবে প্রকাশ করে থাকেন। এও আল্লাহ্‌র এক কুদরতের নিদর্শন।

জমিনকে আল্লাহ্ যেমন প্রয়োজনানুরূপে কোমল করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি শুষ্ক আর শীতলও করেছেন। যদি জমিন হতো পাথরের ন্যায় কঠিন ও বন্ধুর, তবে না চলতো কৃষিকাজ আর না করতে পারা যেত ঘর–দরজা তৈয়ার। এটা আল্লাহ্‌রই অপার মহিমা আর কুদরত যে, তিনি জমিনকে তৈরী করেছেন প্রয়োজনানুরূপ কোমল, শুষ্ক ও শীতল, যাতে জমিনের অধিবাসীদের জন্য জমিন ব্যবহার সহজ হয়।

তারপর আল্লাহ্ নিজ কুদরতে উত্তর দিক্‌কে দক্ষিণ দিকের চেয়ে কিছুটা উঁচু করে তৈরী করেছেন, যাতে পানি একদিক থেকে অন্য দিক বয়ে যেতে পারে, আর প্রাণী–জগৎ পানি লাভের সুযোগ পায়, পরে সে পানি গড়িয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়তে পারে। যদি তা না হতো, তবে পানি এক স্থানে দাঁড়িয়ে গিয়ে জমি তলিয়ে দিয়ে সমুদ্র সৃষ্টি করত। বন্ধ হয়ে যেতো লোকের চলাফেরা আর ব্যাহত

হত লোকের সব কাজকর্ম। যেমন আমরা প্লাবনের সময় বিপন্ন হয়ে দুঃখ কষ্ট ভোগ করে থাকি।

এবার জমিনের অভ্যন্তরভাগের প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ এর গর্বে কত সম্পদ লুক্কায়িত রেখেছেন। কোথাও মণি–মুক্তার খনি, কোথাও সোনা–রূপার আকর, কোথাও ইয়াকুত–জমরুদের খনি, কোথাও বা লোহা, তামা, সীসা, গন্ধক, হরিতাল, মর্মর পাথর, চুনা, সিমেন্ট প্রভৃতির বিরাট সঞ্চয়। এগুলির বিস্তারিত বর্ণনা লিখতে গেলে যথেষ্ট সময় আর পৃষ্ঠার প্রয়োজন। এসব খনিজ সম্পদ আমরা আমাদেরই প্রয়োজনে ব্যবহার করি আর কতো কাজে লাগাই তার হিসাব নেই।

পৃথিবী যদি পাহাড়ের ন্যায় উঁচু আর কঠিন হতো, তবে আমরা তার থেকে প্রয়োজন মেটাতে অসমর্থ হয়ে পড়তাম। আল্লাহ্ এ কারণে সমতল ভূমিকে আবশ্যক পরিমাণ কোমল শীতল আর শুষ্ক করে তৈরী করেছেন, যাতে আমরা সর্বাধিক উপকৃত হতে পারি।

জমিন যদি পাহাড়ের ন্যায় কঠিন হতো, তবে কি করে জমিতে কৃষি কাজ করতে সক্ষম হতাম। কেননা কৃষিকাজ নরম এবং সমতল জমিতেই সম্ভব, কারণ ইহা দরকার মতো পানি ধারণ করতে পারে। আর কোমল অংকুর যেন জমি ভেদ করে গজাতে পারে। সেই কোমল অংকুর যখন কাণ্ড ও শাখা বিস্তার করে জমিনে দাঁড়ায়, তখন তার কোমল শিকড়গুলি মাটির অভ্যন্তরে চারদিকে বিস্তার লাভ করে বৃক্ষকে দাঁড় করিয়ে রাখে আর তাকে জীবন্ত ও সজীব রাখার জন্য মাটির ভিতর থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য আহরণ করে উদ্ভিদকে সজীব রাখতে পারে। জমিন কোমল হওয়ার নানা উপকারিতার মধ্যে এও একটি যে, আমরা যেখানে ইচ্ছা সহজেই কূপ, পুকুর ইত্যাদি খুদতে পারি। যদি মাটি প্রস্তরের ন্যায় কঠিন হতো, তবে তা খনন করা হতো প্রায় অসম্ভব। এমনি আমাদের চলাফেরাও হতো ভীষণ কঠিন, কেননা পাথর খুদে রাস্তা নির্মাণ করা হতো অসম্ভব আর নির্দিষ্ট রাস্তা বা পথ না হলে যাতাযাত হয়ে পড়তো সুকঠিন।

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ -

সেই আল্লাহ্ যিনি জমিনে তোমাদের জন্য চলার রাস্তা করে দিয়েছেন যাতে তোমরা গন্তব্যস্থানে পৌছতে পার।

পৃথিবীর মাটি কোমল হওয়ার আর একটি উপকারিতা এই যে, আমরা গৃহাদি নির্মাণে এর মাটি সহজে কাজে লাগাতে পারি। ইট তৈরী করি, সুরকি বানাই, পাত্রাদি নির্মাণে ব্যবহার করি–এমনি বহু প্রয়োজনে ব্যবহার করি।

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا -

তিনি তোমাদের জন্য জমিনকে অধীনস্থ করে দিয়েছেন। সুতরাং তোমরা এর রাস্তার উপর চলাফেরা কর। (সূরা মুল্‌ক)

যেখানকার মাটি থেকে লবণ, ফিট্‌কারী, আর গন্ধক বের হয় সেখানের মাটি খুবই নরম হয়ে থাকে। নরম জমিতে নানা শ্রেণীর উদ্ভিদ জন্মায়। কঠিন আর পার্বত্য ভূমিতে তা জন্মান সম্ভব নয়। নরম মাটিতে বহু প্রাণী তাদের আশ্রয় ও বাসস্থান বানিয়ে তাতে বাস করে! মাটিতে বসবাসকারী প্রাণী গর্ত ও বাসা নির্মাণ করে তাতে বাস করে। মাটি নরম হওয়ার কারণে এ সুবিধা তারা ভোগ করে থাকে।

জমিনের গর্ভে খনি সৃষ্টি–আল্লাহ্‌র অপার মহিমার নিদর্শন। আল্লাহ্ হযরত সুলায়মান (আঃ)–এর প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রকাশ প্রসঙ্গে এ বিষয়ে উল্লেখ করেনঃ

وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ -

আর আমি তার জন্য তাম্রের কূপ প্রবাহিত করে দিয়েছি। (সূরা সাবা)

মহান কৌশলী সৃষ্টিকর্তা পৃথিবীর বুকে পর্বত সৃষ্টি করেছেন। এর সম্যক উপকারিতা এক আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তার উপকারিতাগুলির মধ্যে এক হচ্ছে, আল্লাহ্ আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যা উদ্ভিদ আর প্রাণী জগতকে বাঁচিয়ে রাখার অবলম্বন। যদি পাহাড়গুলি না থাকত, তবে বায়ু আর সূর্যের তাপে পানি শুকিয়ে যেত। এমতাবস্থায় জমিন খনন করা ছাড়া পানি পাওয়ার কোন উপায় থাকত না। আল্লাহ্ পরম কৌশলে দুনিয়ার বুকে পাহাড়গুলি তৈরী করেছেন। সেগুলির অভ্যন্তরে বিরাট জলাশয়ে পানি সঞ্চিত হয়ে থাকে আর সে পানি নদীনালার রূপ নিয়ে অল্প অল্প করে প্রবাহিত হয়। এভাবে দূর দূর ব্যাপী পানি সঞ্চিত হয়। গ্রীষ্মকালে এই পার্বত্য স্রোতধারা আরো

বাঞ্ছিত হয়ে পড়ে। আর বর্ষা নেমে আসার পূর্ব পর্যন্ত লোক সে পানির সাহায্য নেয়।

যে সকল পর্বতের ভিতরে পানি জমবার কোন ব্যবস্থা নেই, সেখানে বরফের আকারে পর্বতের উপর পানি সঞ্চিত করে রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সূর্যের উত্তাপে যে অল্প অল্প বিগলিত হয়ে নদীনালা আর স্রোতধারায় গিয়ে জমিনের বাসিন্দাদের প্রয়োজন মেটায়। পাহাড়ের উপর অনেক জায়গায় বড় বড় জলাশয় থাকে। সেখানে অনেক পানি সঞ্চিত থাকে, আর প্রয়োজনের ক্ষেত্রে তা দিয়ে প্রয়োজন মিটানো হয়। যেমন বড় বড় শস্য গুদাম থেকে প্রয়োজনের সময় কাজে লাগান হয়।

এছাড়া পাহাড় অঞ্চলে বিশেষ ধরনের বৃক্ষ আর লতা–গুল্মাদি পাওয়া যায়, যেগুলি অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। পাহাড়ে অনেক বড় বড় বৃক্ষ জন্মে। দালান, নৌকা, জাহাজ ইত্যাদি নির্মাণে সেই বৃক্ষের কাঠই বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়। এ কাঠ অন্য কোন বৃক্ষ থেকে পাওয়া যায় না। পাহাড়ে সুন্দর স্বাস্থ্যকর স্থান রয়েছে। সেখানে মানুষ অবকাশ যাপন করে থাকে। শুধু মানুষই নয়, বরং চতুষ্পদ ও অন্যান্য প্রাণীদের জন্যও পাহাড়ের উপর রয়েছে চারণভূমি আর বিশ্রামের জন্য খোলা প্রান্তর। মৌমাছিরা পাহাড় অঞ্চলে মৌচাক তৈরী করে। মৃতদেহ দাফন করার জন্য পাহাড়কে নিরাপদ স্থান বলে গণ্য করা হয়।

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ -

আর তারা পাহাড়ে নিরাপদ গৃহ নির্মাণ করে থাকে। (সূরা হজর)

পাহাড়ের আর একটি উপকারিতা এই যে, পথিকের পথঘাট নির্ণয়ের উদ্দেশ্যে পাহাড়ের উপর বড় বড় নিশান গেড়ে দেওয়া হয়। ভ্রমণকারীদের ভ্রমণের সময় পথ নির্ণয়ে এ দিয়ে যথেষ্ট সাহায্য হয়ে থাকে।

পর্বতের আর একটি উপকারিতা এই যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সৈন্যদল যারা শত্রুদের সাথে যুদ্ধে অপারগ, তারা পর্বতে আশ্রয় নিয়ে থাকে, আর পাহাড়কে দুর্গের পরিবর্তে ব্যবহার করে শত্রুর হামলা থেকে আত্মরক্ষা করে।

আল্লাহ্র অপার কুদরত লক্ষ্য কর; তিনি কি কৌশলে মাটির ভিতরে সোনার খনি সংরক্ষিত করেছেন। আর তা সৃষ্টি করেছেন নির্দিষ্ট পরিমাণ। অবশ্য তা পানির ন্যায় অফুরন্ত সৃষ্টি করেন নি। যদিও আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে পানির ন্যায়ই তা অফুরন্ত সৃষ্টি করতে পারতেন। কিন্তু এটাও আল্লাহ্র হিক্মত ও কুদরত যে, তিনি সোনা–রূপা নির্দিষ্ট পরিমাণ তৈরী করেছেন এবং এতেই রয়েছে কল্যাণ। আর সে রহস্য এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়।

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَإِنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ -

আর আমার নিকট যে সকল জিনিস সঞ্চিত রয়েছে, আমি উহা নির্দিষ্ট পরিমাণ অবতীর্ণ করে থাকি। (সূরা হজরঃ আয়াত ২১)

সমুদ্র সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا -

আল্লাহ্ সমুদ্রকে তোমাদের অনুগত করেছেন তা থেকে তোমরা সদ্য মৎস্য-মাংস খাও। (সূরা নাহলঃ আয়াত ১৪ এর অংশ)

'আল্লাহ্ সমুদ্র সৃষ্টি করেছেন আর তাকে বহু কল্যাণের উৎস হিসাবে বিশাল ও বিরাট করেছেন। আর তাকে স্থলভাগের চতুর্দিকে এমনভাবে পরিবেষ্টিত করে দিয়েছেন, যাতে স্থলভাগ আর পাহাড় পর্বত তার মুকাবিলায় একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় মনে হয়। চারদিকে পানি আর পানি। আর সে অনুসারে সমুদ্রের জীব-জানোয়ার অর্থাৎ স্থলভাগের জীবজন্তু থেকে সমুদ্রের জীবজন্তু কয়েক গুণ বেশী। সমুদ্রে আল্লাহ্ এমন সব বিস্ময়কর বস্তু সৃষ্টি করেছেন, যা আল্লাহ্র অসীম কুদরতেরই স্মরণ করিয়ে দেয়। সমুদ্রে জীব-জন্তু, মণি-মুক্তা আর সুগন্ধি দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়, স্থলভাগে তত পাওয়া যায় না। আবার সমুদ্রে এমন সব বিরাটকায় জন্তু রয়েছে, যদি তার দেহের অংশ বিশেষ পানির উপরে ভাসে তবে তা পাহাড়ের টিলা বলে সন্দেহ হয়। স্থলভাগে যেমন পাখী, ঘোড়া, গরু প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জীব-জন্তু রয়েছে তার চেয়ে কয়েক গুণ বেশী পাওয়া যায় সমুদ্রে। বরং সমুদ্রে যত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রাণী দেখা যায় স্থলভাগে তা দেখা যায় না। তারপর আল্লাহ্ তার অসীম ক্ষমতা ও কুদরতে সেগুলির জীবন ধারণের উপায় উপকরণ সৃষ্টি করেছেন,- যদি সেগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় তবে কয়েক খণ্ড বিরাট গ্রন্থের প্রয়োজন হবে।

আল্লাহ্ কি কৌশলে মোতিকে ঝিনুকের গর্ভে সৃষ্টি করেছেন। আর মারজানকে সমুদ্রের তলায় পাথুরে চটানের নাচে কিভাবে সংরক্ষিত করেছেন।

আল্লাহ্ বলেনঃ

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ -

সমুদ্র থেকে মোতি আর মারজান বের হয়। (সূরা রহমানঃ আয়াত ২১)

কুরআনে উল্লেখিত 'মারজান' সম্পর্কে কোন কোন জ্ঞানী লোক বলেছেন যে, সেটাও এক ধরনের মোতি, তবে অনেকটা সরু আর ছোট। আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহের পরে আল্লাহ্ বলেনঃ

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -

অতঃপর তোমরা আল্লাহ্র কোন কোন দানকে অস্বীকার করবে?

(সূরা রহমানঃ আয়াত ২৩)

'আলা-ই' অর্থ আল্লাহ্র দান ও অনুগ্রহ। এমনি আম্বর প্রভৃতি বহু মূল্যবান সামগ্রী আল্লাহ্ সমুদ্রে পয়দা করেছেন। পানির উপরে বিরাট নৌকা ও জাহাজ ভেসে চলার প্রতি লক্ষ্য কর। এর দ্বারা মানুষ তাদের কত প্রয়োজন মেটায়।

আল্লাহ্ এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলেনঃ

وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ -

জাহাজগুলি সমুদ্রে চলাচল করে যাতে লোকের লাভ হচ্ছে।

(সূরা বাক্বারাঃ আয়াত ১৪৬ এর অংশ)

আল্লাহ্ সমুদ্রের উপর মানুষকে ক্ষমতা দিয়েছেন। মানুষ তার বুকের উপর দিয়ে মাল বোঝাই বড় বড় জাহাজ নিয়ে দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করে থাকে, যদি মানুষ যানবাহনের এ সুযোগ লাভ না করত তবে জীবনযাত্রা সুকঠিন হতো, এক দেশ থেকে অন্য দেশে এত মাল ও পণ্যদ্রব্য আনা নেওয়া সম্ভব হতো না। এতে মানব জীবনে দুঃসহ অবস্থা সৃষ্টি হতো।

আল্লাহ্র কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি পানি কিরূপ তরল এবং বহমান করে সৃষ্টি করেছেন। ইহা এরূপ অভিন্ন এবং সংমিশ্রণশীল, যেন সারা দুনিয়ার পানি একটি দেহ। ইহা যেমন সহজে পরস্পরে মিশ্রিত হয় তেমনি সহজেই বিচ্ছিন্ন হয়। এক পানি অন্য পানির সাথে মিলিত হয়ে অভিন্ন হয়ে যায়। আবার তা বিচ্ছিন্ন করাও সহজ। পানির বহমানতা আর তরলতার কারণে এর উপর যানবাহন চলা সম্ভব হয়েছে।

আল্লাহ্ এসব নেয়ামত আর দানসমূহের প্রতি যারা লক্ষ্য না করে, তাদের জ্ঞানের প্রতি আক্ষেপ। অথচ সৃষ্ট সব কিছুর মধ্যেই আল্লাহ্‌র মহাশক্তি আর কৌশলের সুস্পষ্ট নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَفِى كُلِّ شَىْءٍ لَهُ آيَةٌ - تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ -

প্রত্যেকটি জিনিসের মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্‌র নিদর্শন যা তাঁর একত্বের সাক্ষ্য দান করছে।

আল্লাহ্‌র এ সব সৃষ্টি যেন ডেকে ডেকে বলছে, হে মানুষ, তোমাদের চোখ থেকে অজ্ঞতার আবরণ দূর করে অন্তরচক্ষু দিয়ে দেখ, আমি কত কিছু উপকারী জিনিস সৃষ্টি করেছি, আর এক আমি ব্যতীত আর কি কেউ সৃষ্টিকর্তা আছে। অথচ তোমরা আমার সাথে শরীক করছ। এইসব হচ্ছে সেই এক লা-শরীক আল্লাহ্‌রই সৃষ্টি, যিনি মানবজাতির উপকারের জন্য এসব সৃষ্টি করেছেন।

পানি সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ - فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ -

আমি পানি দ্বারা প্রত্যেক জীবকে সৃষ্টি করেছি, তারা কি তা বিশ্বাস করে না? আর সে পানি দ্বারা আমি সবুজ বাগিচা সৃষ্টি করেছি, তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না এ বাগান করার। আছে কি কেউ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন মাবুদ অথচ তারা আল্লাহ্‌র সাথে অন্যকে সমকক্ষ করে।

(সূরা আম্বিয়াঃ আয়াত ৩০, —সূরা নমলঃ আয়াত ৬০)

পানির ন্যায় এরূপ অপরিহার্য দ্রব্যকে আল্লাহ্ অফুরন্ত সৃষ্টি করে সৃষ্টির প্রতি অসীম অনুগ্রহ করেছেন। মানব, পশু, তরু-লতা সবারই বেঁচে থাকার জন্য পানি অপরিহার্য। দারুণ পিপাসার সময় যদি পানি না পাওয়া যায় তবে এক ঢোক পানির জন্য সর্বস্ব দিতেও পিছ্‌পা হবে না। পানির যথার্থ মূল্য তখন মানুষ উপলব্ধি করতে পারবে। অথচ আমরা আল্লাহ্‌র এই অনুগ্রহ সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কুণ্ঠিত।

আবার আল্লাহ্‌র অপার মহিমা যে, এমন প্রয়োজনীয় জিনিসকে আল্লাহ্ এত অধিক পরিমাণে সৃষ্টি করেছেন যে, কি মানুষ, কি পশু যে কেউ অনায়াসেই পানি পেয়ে পান করতে পারে। অন্যান্য দ্রব্যের ন্যায় যদি পানি সীমিত পরিমাণে সৃষ্টি করা হতো তবে জীবন ধারণ হতো দুঃসাধ্য বরং সৃষ্টিই ধ্বংস হয়ে যেত।

পানির তরলতা আর সুক্ষ্মতার প্রতি লক্ষ্য কর। আসমান থেকে মাটিতে পড়া মাত্রই তা বৃক্ষের মূলে গিয়ে পৌছে আর তার খাদ্যে পরিণত হয়। আবার সূর্যের তাপে তা বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়। পানি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে খাদ্য সহজে

পাকস্থলীতে পৌছতে এবং হজম করতে সাহায্য করে। পিপাসার সময় পানি পান করতে কি তৃপ্তি, তা পান করে সব ক্লান্তি আর অবসাদ কাটিয়ে উঠে। দেহে অনুভূত হয় পরম শান্তি। পানি দিয়ে গোসল করি, এতে শরীরের ময়লা দূর হয়, ময়লা ও অপরিচ্ছন্ন কাপড় চোপড় ধুয়ে পরিষ্কার পবিত্র করি। পানি মাটির সাথে সহজে মিশে যায়, যাতে আমাদের ঘর–দরজা তৈরী করা সহজ হয়। যে কোন দ্রব্য আমরা পানি দ্বারা নরম আর দ্রবীভূত করি। পানি দ্বারা নানা প্রকারের সুপেয় পানীয় তৈয়ার করি। বড় বড় অগ্নিকাণ্ডের সময় পানির দ্বারা তা নির্বাপিত করা হয়। জ্বলন্ত আগুনের শিখার উপর পানি ছিটিয়ে দিলে তা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। মানুষ যখন চরম ক্রোধান্বিত হয়, তখন পানি পান করলে ক্রোধ নির্বাপিত হয়। মৃত্যুকালে যখন নিদারুণ কষ্ট হয় তখন পানি পান করালে তা কতকটা লাঘব হয়। মজুর সারাদিন পরিশ্রম কর যখন শীতল পানিতে অবগাহন করে এবং এক গ্লাস ঠাণ্ডা পানি পান করে, তখন তার সারাদিনের ক্লান্তি ভুলে যায়। পানাহারের প্রত্যেকটি জিনিস তৈরী করতে পানির মিশ্রণ অপরিহার্য। সুতরাং আল্লাহ্‌র সৃষ্ট এই অমূল্য নেয়ামত কত প্রচুর পরিমাণে আমরা ভোগ করি! যদি পানি এত প্রচুর পরিমাণে না হতো, তবে আমাদের জীবন বড় দুঃসহ হত আর আমাদের কষ্টের সীমা থাকতো না। সুতরাং শোকর সেই আল্লাহ্‌র, যিনি পানি সৃষ্টি করে এত প্রয়োজনে ব্যবহার করার আমাদিগকে সুযোগ দিয়েছেন। আর অসংখ্য কাজে ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে আমাদের জীবনযাত্রাকে সহজ ও শান্তিময় করেছেন।

আল্লাহ্‌র এসব দান যদি গণনা করতে চাই তা হবে আমাদের জন্য অসম্ভব। কুরআন মজীদে ঘোষিত হয়েছেঃ

وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا -

তোমরা যদি আল্লাহ্‌র দানগুলি শুমার করতে চাও তা তোমরা কখনও পারবেনা। (সূরা ইবরাহীমঃ আয়াত ৩৪–এর অংশ)

বায়ু সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ -

আর আমি বায়ু প্রবাহিত করে থাকি যা মেঘকে পানি দ্বারা ভরে দেয়।(সূরা হজর)

অতঃপর আমি সেই পানি আসমান থেকে বর্ষণ করি, তা তোমরা এত পানি সঞ্চয় করতে সক্ষম নও।

আল্লাহ্ তাঁর অপার কুদরতে বায়ুকে পানি মিশ্রিত করে সৃষ্টি করেছেন। যদি এ বায়ু না হতো তবে শুষ্কতার কারণে জীবজন্তু ধ্বংস হয়ে যেত। বায়ুপ্রবাহ প্রাণীদেহে লেগে সেগুলির শরীরের উত্তাপ নিয়ন্ত্রিত করে। বায়ু স্থলচর প্রাণীর জন্য তেমনি অপরিহার্য, যেমনি জলচর প্রাণীদের জন্য পানি। বায়ু যদি শরীরে না লাগে আর দেহের অভ্যন্তরে না পৌছে অথবা অল্পক্ষণের জন্যও যদি বায়ু বন্ধ হয়, তবে সারা দেহের তাপ হৃদপিণ্ডে গিয়ে পৌছে আর উত্তাপের আধিক্যে প্রাণনাশ হয়, যা আমরা শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার এবং বায়ুবদ্ধ হওয়ার ফল বলে প্রকাশ করে থাকি।

তারপর লক্ষ্য কর আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রতি, যার ফলে বায়ু এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চালিয়ে নিয়ে যায়। আর জলহীন ঊষর ভূমিকে বর্ষা দ্বারা সিঞ্চিত করে। এভাবে আল্লাহ্‌র কুদরতে আমাদের ফসলের জমি উর্বর হয়। যদি আল্লাহ্ বায়ু দ্বারা মেঘ নানা স্থানে পরিচালনা না করতেন তবে পানির ভারে হয়ত মেঘ এক স্থানেই দাঁড়িয়ে থাকত অথবা একই স্থানে বর্ষা হতো। ফলে আমাদের বাগ–বাগিচা যেত শুকিয়ে ও ধ্বংস হয়ে।

বাতাসের সাহায্যে নদীতে ও সমুদ্রে জাহাজ চলাচল করে। এভাবে এক দেশের পণ্যদ্রব্য অন্য দেশে আমদানী ও রফতানী করা হয়। (বাষ্পযুগের পূর্বে সমুদ্রে বড় বড় জাহাজ বাদামের সাহায্যেই চলাচল করত)। যদি এভাবে জাহাজে মাল চলাচল না হতো তবে ব্যবসা–বাণিজ্যের প্রসার হতো না এবং

লোক তাঁদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি আমদানী রফতানী করতে পারত না। ফলে উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি অপচয় হতো। অন্য দেশের লোক হয়তো সে জিনিসের অভাবে কষ্ট ভোগ করতো।

দেখ! আল্লাহ্ বাতাসকে কিরূপ সূক্ষ্ম করে সৃষ্টি করেছেন। বায়ু অতি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে সহজেই সব জায়গায় তাহা প্রবেশ করতে পারে আর দুর্গন্ধ ও দুষিত বায়ু দূর করে স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে, অন্যথায় দুর্গন্ধে সারাদেশ পরিপূর্ণ হয়ে যেত। আর হাওয়া দুষিত হয়ে রোগ–ব্যাধি বিস্তার করত আর তা হতো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য ধ্বংসের কারণ।

বায়ুপ্রবাহ ধুলি–বালি উড়িয়ে নিয়ে যায়, বাগানের উপর দিয়ে যখন সে বায়ু চলে, তখন গাছের পাতাগুলি পরিষ্কার করে দেয়! এতে পাতা সজীব ও জীবন্ত হয়ে উঠে। এমনিভাবে বায়ু পাহাড়ের উপর মাটির স্তর জমিয়ে দেয়, যাতে সেখানে কৃষি কাজ সম্ভব হয়। সমুদ্র উপকূলে বায়ু প্রবাহে যে তরঙ্গ সৃষ্টি হয় এতে আম্বর প্রভৃতি সুগন্ধিযুক্ত মূল্যবান দ্রব্য উৎপন্ন হয়।

বায়ুপ্রবাহে বৃষ্টির পানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হয়ে আকাশে ছড়িয়ে গিয়ে সর্বত্র ছিটিয়ে পড়ে। যদি বায়ু এভাবে পানিকে বিক্ষিপ্ত না করতো তবে মেঘের পানি জমা হয়ে এক জায়গায় পড়তো, তাতে জানমালের ক্ষতি হতো। আল্লাহ্ তাঁর অসীম কুদরতে বায়ুর সাহায্যে পানি এত সহজে পৃথিবীতে ছিটিয়ে দেন যে, এতে কারো কোন প্রকার ক্ষতি হয় না। পানি এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফোটাগুলি ক্রমান্বয়ে বিস্তারিত ভূ–খণ্ডে বর্ষিত হয়ে নহর–নালার রূপ নিয়ে প্রবাহিত হয়। তারপর এর ব্যাপক কার্যকারিতা দেখ, আল্লাহ্‌র দোস্ত দুশমন সকলেরই এতে সমভাবে উপকার হয়ে থাকে। বায়ু যেমন জীবনের জন্য অপরিহার্য তেমনি আল্লাহ্ একে অফুরন্ত সৃষ্টি করেছেন। এর সীমাহীন উপকারিতার মধ্যে প্রতিভাত হয় আল্লাহ্‌র সীমাহীন কুদরত।

আল্লাহ্ বলেনঃ

هُوَ الَّذِىٓ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً لَّكُمْ مِّنْهُ شَرَابٌ وَّمِنْهُ شَجَرٌ فِيْهِ تُسِيْمُوْنَ - يُنْۢبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُوْنَ

وَالنَّخِيْلَ وَالْاَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرٰتِ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ -

আর আল্লাহ্ তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন, যা থেকে তোমরা পান কর, আর তা থেকে সৃষ্টি হয় লতা, তাতে তোমাদের পশুগুলি চড়াও আর বর্ষার পানিতে তোমরা ফসল উৎপাদন কর, জয়তুন, খেজুর, আঙ্গুর, সব রকমের ফল, নিশ্চয় এতে রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য আল্লাহ্‌র একত্বেরনিদর্শন। (সূরা নাহলঃ আয়াত ১০, ১১)

আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন দেখ। বর্ষার মওসুমে মাঝে মাঝে হয় বর্ষার বিরাম, আসমানে থাকে না মেঘের চিহ্ন, বায়ুও প্রশমিত। এতে লোকের জোটে সুযোগ আর অবকাশ। যদি সারা বর্ষাকালেই বৃষ্টি হতে থাকত, তবে মানুষ আর অন্য সব প্রাণী উঠতো অতিষ্ঠ হয়ে। এমনি যদি অবিরাম বায়ুপ্রবাহ বন্ধ থাকত তবে তা হতো সবার জন্য অশেষ কষ্টের কারণ। লোকের কাজ–কর্ম হয়ে পড়তো অচল। তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ যে, যখন বর্ষাধারা বিরামহীনভাবে পড়তে থাকে তখন ফসল নষ্ট হয়ে যায়, ঘরবাড়ী ধসে পড়ে, পানিতে প্লাবিত হয়ে যায় পথ–ঘাট, যানবাহন চলাচল যায় বন্ধ হয়ে। এভাবে ব্যবসা–বাণিজ্য দারুণ বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

আর যদি শুরু হয় একাধারে অনাবৃষ্টি এবং বাতাস বন্ধ হয়ে যায়, তাতে শরীর যায় শুষ্ক হয়ে। ক্ষেতের ফসল সব জ্বলে পুড়ে যায়, খাল–বিল পুকুর ডোবার পানি যায় ফুরিয়ে আর যা অবশিষ্ট থাকে, তা হয়ে পড়ে দুষিত। এতে আবহাওয়া দুষিত হয়ে পড়ে, দেখা দেয় মহামারী। ফসল উৎপাদন হ্রাস পায়, অথবা একদম বন্ধ হয়ে যায়, ফলে দেখা দেয় জিনিসপত্রের দুর্মূল্য। তৃণের অভাবে পশু হয়ে পড়ে শীর্ণ আর দুর্বল। চারণভূমি তৃণহীন শুষ্ক মাঠে পরিণত হয়। মৌমাছি আহরণ করতে পারে না মধু। মোটকথা, অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি যেটাই হোক, মানুষ–পশু–পাখী আর তৃণলতা, কীট পতঙ্গ সবারই জন্য তা হয় বিপর্যয়ের কারণ। এ কারণেই আল্লাহ্ বৃষ্টির পর খরা আর খরার পর বৃষ্টি বিধিবদ্ধ করেছেন, যাতে একটির ক্ষতি অপরটির দ্বারা পূরণ হয়। বায়ুমণ্ডলে ভারসাম্য সৃষ্টি হয় আবার তাতে দেখা দেয় নানা সুফল। আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের ফলে প্রকৃতিতে শৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

যদি কেউ জ্ঞান ও দৃষ্টিশক্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে এ প্রশ্ন করে বসে যে, উপরোক্ত অবস্থার শিকার হয়ে অনেক সময় ক্ষতি পোহাতে হয়। তাদের জন্য উত্তর এই যে, তার কারণ হলো মানুষের প্রতি আল্লাহ্র ইমৃতেহান আর ঈমানের প্রতি আযমায়েশ। পরস্পর বিরোধী প্রাকৃতিক অবস্থা দ্বারা সৃষ্ট জীবের কিভাবে উপকার হচ্ছে একথা উপলব্ধি করানোই এ দ্বারা আল্লাহ্র উদ্দেশ্য। যা একমাত্র আল্লাহ্রই অনুগ্রহের ফলে সম্ভব হচ্ছে। নাফরমানদের চেতনা ফিরিয়ে আনা আর জুলুমবাজি থেকে বিরত করাও আল্লাহ্র উদ্দেশ্য এতে রয়েছে। নিশ্চয়ই দেখে থাকবে মানুষের যখন রোগ–ব্যাধি হয় তখন সে রোগ দূর করার জন্য কত তিক্ত ও বিস্বাদ ঔষধ ব্যবহার করে থাকে। তখন ক্ষণিকের জন্য তার এ চেতনা অবশ্যই জাগরিত হয় যে, আল্লাহ্ দুনিয়াতে কোন কিছুই বেকার সৃষ্টি করেন নি। যে জিনিস তিক্ত আর বিস্বাদ তার ভিতরে আল্লাহ্ রোগ নিরাময়ের রহস্য নিহিত রেখেছেন। আল্লাহ্ই সে বিষয়ে সর্বাধিক জ্ঞানী।

وَلٰكِنْ يُّنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ وَإِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ -

আর আল্লাহ্ পরিমাণ মতোই সব কিছু অবতীর্ণ করে থাকেন। নিশ্চয়ই তিনি বান্দাদের বিষয় খবর রাখেন আর দেখেন। (সূরা শুরা)

অগ্নি সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ - ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ - نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ - فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ -

দেখতো! আগুন, যা তোমরা জ্বালাও তার বৃক্ষ কি তোমরা পয়দা করেছ, না আমি পয়দা করেছি? আমিই তা পয়দা করেছি, স্মরণ করার জন্য আর ব্যবহারের জন্য। সুতরাং তোমরা মহান প্রতিপালকের গুণ–গান কর।

(সূরা ওয়াক্বেয়াঃ আয়াত ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪)

আগুনের ন্যায় উপকারী পদার্থ সৃষ্টি করে আল্লাহ্ তার বান্দাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। আর তার প্রাচুর্য হতো সৃষ্টির পক্ষে বড় বিপদের কারণ—এ কারণে আল্লাহ্ পরম কৌশলে অগ্নিকে এভাবে সংরক্ষিত করে রেখেছেন যে, প্রয়োজনের সময় তা হাসিল করা যায় তারপর আবার তা নির্বাপিত ও অদৃশ্য হয়ে যায়। অগ্নিকে কোন কোন পদার্থের ভিতর এভাবে লুকায়িত রেখেছেন যে প্রয়োজনের সময়ই তা যেন পাওয়া যায়। এভাবে আমরা তার ক্ষতি আর অনিষ্ট থেকে বেঁচে থাকতে পারি।

আমাদের জীবন ধারণের বেলায় অগ্নির রয়েছে অশেষ কার্যকারিতা। আগুন ছাড়া কি করে সম্ভব হতো খাদ্যদ্রব্য পাকানো? আমাদের খাদ্যাদি আগুন ছাড়া কখনো ব্যবহারযোগ্য হতে পারতো না। খাদ্যের বিভিন্ন অংশ আগুনের জ্বাল ব্যতীত একটি অপরটির সাথে মিশ্রিত হয়ে আমাদের জন্য উপকারী খাদ্য তৈয়ার হতে পারতো না। যদি আল্লাহ্ অগ্নি পয়দা না করতেন তবে আল্লাহ্র সৃষ্ট বহু জিনিস আমরা কিরূপে ব্যবহার করতে সক্ষম হতাম? অগ্নি ব্যতীত স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, লৌহ, সীসা প্রভৃতি দ্রব্য আমরা কোন কাজে লাগাতে পারতাম না, অগ্নির সাহায্যে স্বর্ণ, রৌপ্য ও অন্যান্য ধাতব পদার্থ গলিয়ে আমরা অলংকার, অস্ত্র শস্ত্র

ও পাত্রাদি তৈয়ার করি। খনিজ দ্রব্য আল্লাহ্‌র এক বিশেষ দান। আর সেগুলির ব্যবহার শিক্ষা দিয়ে আল্লাহ্ আমাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এজন্য আল্লাহ্‌র দরবারে আমাদের সীমাহীন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে হয়।

আল্লাহ্ বলেনঃ

اِعْمَلُوْا اٰلَ دَاوٗدَ شُكْرًا ـ

হে দাউদের বংশধর, 'তোমরা আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে কাজ কর।'
(সূরা সাবা)

লৌহই ধর, লৌহ অগ্নিতে গলিয়ে আমরা কি কি কাজের জিনিস তৈরী করি, শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য কি কি যুদ্ধাস্ত্র তৈরী করে থাকি, সে সব জিনিস ও যুদ্ধাস্ত্রের বিবরণ লিখতে যাই তাতে অনেক পৃষ্ঠা প্রয়োজন হবে।

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ـ

আমি লোহা সৃষ্ট করেছি যাতে রয়েছে মহাশক্তি আর লোকের বহু উপকার।
(সূরা হাদীদঃ আয়াত ২৫—এর অংশ)

لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَاْسِكُمْ فَهَلْ اَنْتُمْ شَاكِرُوْنَ ـ

তা হচ্ছে যুদ্ধে তোমাদের আত্মরক্ষার সম্বল। সুতরাং তোমরা কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর?
(সূরা সাবা)

লোহা দ্বারা আমরা কৃষিকাজের যন্ত্রাদি তৈরী করি, পাহাড় থেকে বড় বড় পাথর কেটে আনি। এমনকি সে যন্ত্রের সাহায্যে পাহাড় বিধ্বস্ত করে দেই আর তা সমতল করে তৈরী হয় চলার পথ। এভাবে অজস্র জিনিস যা আমরা লোহা দিয়ে তৈরী করি, তা সম্ভব হয় অগ্নির সাহায্যে। অগ্নি যদি না হতো তবে উপরোক্ত আসবাবপত্র আর যন্ত্রাদি আমরা তৈরী করতে সক্ষম হতাম না। আবার বিভিন্ন ধাতু দ্বারা তৈরী মুদ্রা বিনিময় করে আমরা ব্যবসা বাণিজ্য চালাই ও নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস সংগ্রহ করি তা থেকে আমরা বঞ্চিত হতাম। আমাদের সাজ–সজ্জার উপকরণ ও অলংকারাদি তৈরী হতো না। আর ধাতব দ্রব্যাদির ব্যবহার থেকে আমরা একেবারেই বঞ্চিত থেকে যেতাম।

অগ্নিতে আল্লাহ্ আলো ভরে দিয়েছেন। রাত্রির অন্ধকারে যখন আমরা অকর্মণ্য ও ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ি তখন অগ্নির সাহায্যে প্রদীপ জ্বেলে আমরা অন্ধকার দূর করি আর স্বস্তি ও সাহস অর্জন করি। মজলিস মাহফিলে নানা ধরনের প্রদীপ জ্বেলে আলোকিত করি আর গভীর অন্ধকারে আগুন জ্বেলে আমরা ভয়–ভীতি থেকে রক্ষা পাই। অগ্নি জ্বেলে হিংস্র প্রাণীর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করা হয়ে থাকে। যুদ্ধের সময় অগ্নি অস্ত্ররূপে ব্যবহার করা হয়, অগ্নি ব্যবহারের শেষ নেই। অগ্নি জ্বেলে আমরা যুদ্ধের সময় দুর্গাদি রক্ষা করে থাকি। আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর—অগ্নির মধ্যে তিনি মানুষের জন্য কত উপকার নিহিত রেখেছেন। এমন একটি অপরিহার্য পদার্থের অধিকার আমাদের হাতের মুঠোয় ছেড়ে দিয়েছেন; যখনই ইচ্ছা তা জ্বেলে কাজ করি আবার তা নিভিয়ে রেখে দেই।

মানব সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ -

আর আমি মানুষকে মাটির পিণ্ড দ্বারা তৈরী করেছি।

(সূরা মোমেনঃ আয়াত ১২)

আল্লাহ্ যখন মানবকে সৃষ্টি করে পৃথিবীতে প্রেরণের ইচ্ছা করলেন, তখন তিনি তার সৃষ্টির ব্যবস্থা এভাবে করলেন যেন এক এক থেকে ক্রমান্বয়ে বংশধারা সৃষ্টি হয়। সুতরাং পুরুষ আর নারী এ দু' শ্রেণীতে মানুষ সৃষ্টি করা হলো। আর তাদের মধ্যে আল্লাহ্ সৃষ্টি করে দিলেন পারস্পরিক ভালবাসা ও আকর্ষণ। আর তা একে অন্যের অন্তরে এমনভাবে বদ্ধমূল করে দিলেন যে, তারা পরস্পরে গভীর আকর্ষণে বিচলিত হয়। তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে দিলেন পারস্পরিক কামনা, যাতে দাম্পত্য জীবনে পরস্পর একত্রে বসবাস করতে পারে। মানব দেহে একটি নির্দিষ্ট অংশ সৃষ্টি করেছেন, যার সাহায্যে গর্ভে বীর্য ঢেলে দিতে পারে। সেখানে এসে বীর্য থেকে ক্রমান্বয়ে মানবদেহ রূপান্তরিত হয়। মানবদেহ গঠিত হতে কয়েকটি স্তর অতিক্রম করতে হয়। অর্থাৎ বীর্য থেকে রক্ত, জমাট রক্ত থেকে মাংসপিণ্ড, তারপর অস্থি, তার উপরে গোশ্তের আবরণ, তাকে শিরা-উপশিরা জাল দ্বারা বেষ্টন করে মানবদেহের আকারে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর কান, চোখ ও দেহের অন্যান্য অংশ সৃষ্টি হয়। পরে এতে শক্তির সঞ্চার হয়। চক্ষের দৃষ্টিশক্তি এমন এক বিস্ময়কর ব্যাপার, যা ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। চক্ষু সাত স্তরে গঠিত। তার প্রত্যেক স্তরের কাজ ভিন্ন এবং তার আকারও ভিন্ন। যদি তার একটি স্তরও নষ্ট হয়ে যায় তবে চক্ষের দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে। চক্ষের চতুর্দিকে সূক্ষ্ম পলকগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, চক্ষের ন্যায় নাজুক অংগের হেফাজতের জন্য এগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে। একে আল্লাহ্ দ্রুত উঠানামার শক্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। চোখের দিকে ক্ষুদ্র কোন কিছু আসতে দেখা মাত্র পলকগুরি দ্রুত সক্রিয় হয়ে ওঠে আর বিরপদাশংকা থেকে চক্ষুকে রক্ষা করে। বায়ুতে উড়ন্ত ধূলা-বালি থেকে চক্ষুকে বাঁচায়, পলক দুটি

যেন চোখের দুখানি কপাট, প্রয়োজনে খুলে যায় আবার প্রয়োজন মত বন্ধ হয়ে চোখকে আপদ-বিপদ থেকে রক্ষা করে।

চোখের হেফাজত ছাড়াও পলক সৃষ্টির মধ্যে চেহারার এবং চোখের সৌন্দর্যও নিহিত রয়েছে। এ কারণে পলকের পশমগুলি পরিমাণ মত সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি খুব লম্বা হতো তা হতো চোখের পক্ষে পীড়াদায়ক আর যদি খুব ছোট হতো তা হতো চোখের পক্ষে ক্ষতিকর। চোখের পানিকে আল্লাহ্ লবণাক্ত করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে চোখের ভিতরের ময়লা পরিষ্কার হয়ে যায়। পলকের উভয় পার্শ্ব কিছুটা নিম্নমুখী ঝুঁকানো, যাতে চোখের পানি চোখের কোণ দিয়ে বয়ে যেতে পারে। চোখের ভ্রুগুলি যেমন চোখকে হেফাযত করে, তেমনি চেহারার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি করে। ঝালরের ন্যায় সজ্জিত পশমগুলি চেহারাকে অপরূপ শোভায় শোভিত করে। মাথা আর দাড়ির কেশগুচ্ছ আল্লাহ্ এভাবে সৃষ্টি করেছেন, যা একটা নির্দিষ্ট নিয়মে বর্ধিত হয়, মানুষ তা কেটে-ছেটে চেহারা ও আকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে। মুখ আর জিহবা আল্লাহ্র সুনিপুণ কারিগরির দুটি নিদর্শন। মুখ বন্ধ করার জন্য কপাট স্বরূপ দু'খানা ওষ্ঠ সৃষ্টি করা হয়েছে, যা প্রয়োজনের সময় খোলা যায় আর যখন প্রয়োজন থাকে না তখন তা বন্ধ রেখে ক্ষতিকর দ্রব্য মুখে প্রবেশ করা থেকে রক্ষা করা যায়। তা ছাড়া দাঁত আর মাড়ির হেফাযতও ওষ্ঠের দ্বারা হয়ে থাকে। ওষ্ঠ না হলে মুখ দেখতে বিশ্রী আর তার হেফাযতও হতো না। কথা বলার সময় ওষ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন। ওষ্ঠের সঞ্চালনে বর্ণ উচ্চারণ করা হয়। বর্ণের সাহায্যে শব্দের সৃষ্টি হয়; আর তার সাহায্যে মানুষ মনের ভাব ব্যক্ত করে।

ওষ্ঠের সাহায্যে পানাহারে সুবিধা হয়। মুখের মধ্যে খাদ্য নাড়াচাড়া করার বেলায় ওষ্ঠের সাহায্য প্রয়োজন।

দন্তপাটির গঠন দেখ। আল্লাহ্ কিভাবে তা গঠন করেছেন। দাঁতগুলি বত্রিশ খণ্ডে বিভক্ত করা হয়েছে। সবগুলি খণ্ড একখানা হাড় করে তৈরী করা হয় নাই। যদি তা হতো, তবে তা হতো ভারি অসুবিধাজনক। দাঁতগুলি যেভাবে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন তাতে দু' একটি দাঁত নষ্ট হলে বাকীগুলি ব্যবহার করা যায়। যদি দাঁত একখানা অভিন্ন হাড় হতো তবে তা সম্ভব হতো না। মুখের শ্রী সৌন্দর্য ছাড়াও দাঁত দ্বারা অনেক কাজ করে থাকি। দাঁত ছাড়া আহার করাই কঠিন হতো। কোন শক্ত দ্রব্য খাওয়া চলতো না। দাঁত এমন মজবুতভাবে গড়া

যে, কঠিন ও শক্ত হাড়গুলি দাঁতের সাহায্যে চুরমার করা যায়। এ কারণে মাড়ির গোশত বিশেষ শক্ত করে তৈরী করা হয়েছে। নরম হলে দাঁতগুলি সুদৃঢ় আর কাজের উপযুক্ত হতো না। খাদ্য উত্তমরূপে চর্বিত হওয়ার প্রয়োজন এই যে, খাদ্যদ্রব্য পেটে দিয়ে তা সহজে হজম হয়ে শরীরে পুষ্টির সৃষ্টি করে। আর দেহকে কর্মক্ষম ও শক্তিশালী করে তোলে। দেহ-বিজ্ঞানীদের মতে খাদ্য পরিপাকের কয়েকটি স্তর রয়েছে। তার প্রথম স্তর হচ্ছে মুখ। তাকে প্রথম পরিপাক বলে। দাঁতের দুই পার্শ্বে শক্ত মাড়ি রয়েছে, এর সাহায্যে শক্ত দ্রব্য চর্বণ করা যায়। ইহারা সুদৃঢ় গোড়ালী বিশিষ্ট মোতির মালার ন্যায় পরস্পর সন্নিহিত। দু'পাটি দাঁত মুখের মধ্যে অতি সুন্দর দেখায়।

মুখের গহবরে আল্লাহ্ তরল লালা এমনভাবে গুপ্ত রেখেছেন, যা খাদ্যদ্রব্য চর্বণের সময় নির্গত হয়। আর তা খাদ্যের সাথে মিশে হজম ক্রিয়ায় সহায়তা করে। তা যদি অন্য সময়ে মুখ ভরে থাকত তবে কথাবার্তা বলা হতো ভারী অসুবিধা, আর মুখ খোলাই হতো কঠিন। কেননা, মুখ খুলতেই তা বের হয়ে পড়তো সুতরাং তা খাদ্য চর্বণের সময় বের হয়ে হজমের সহায়তা করে আর খাবার পরে লালা নির্গত হওয়া বন্ধ হয়ে যায়। এতে আল্লাহ্র অশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় বিদ্যমান। অবশ্য পরে এতটা লালা থেকে যায়, যা কণ্ঠনালী সিক্ত রাখে, শুকিয়ে না যায়। যদি কণ্ঠনালী শুকিয়ে যেত তবে কথা বলা হতো দুঃসাধ্য। এমনকি কণ্ঠনালী শুকিয়ে যাওয়ার ফলে শ্বাস গ্রহণ করা হয়ে পড়তো অসম্ভব, ফলে প্রাণনাশ অনিবার্য হয়ে পড়তো। আবার আল্লাহ্র হেকমত আর কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর। তিনি মানুষের আহার করার জন্য জিহ্বায় স্বাদ গ্রহণের শক্তি নিহিত রেখেছেন, যাতে সে রুচিকর খাদ্য গ্রহণ করে আর অরুচিকর ও বিস্বাদ খাদ্য বর্জন করে। স্বাদের কারণে খাদ্য হয় আরামদায়ক আর সুখকর, আর সুস্বাদু খাদ্য অতি সহজে হজম হয়।

খাদ্যদ্রব্য তাজা, বাসি, ঠাণ্ডা, গরম সব কিছু জিহ্বাই যাচাই করে।

আল্লাহ্ বলেনঃ

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ.

আমি কি তার জন্য দুই চোখ জিহ্বা আর ওষ্ঠ দেইনি? (সূরা বালাদ)

আল্লাহ্ মানুষকে দুটি কান দিয়েছেন। কানের অভ্যন্তরে এক প্রকার তরল দ্রব্য রয়েছে, যা শ্রবণ শক্তিকে সংরক্ষণ করে। আর কীট প্রভৃতি অনিষ্টকর প্রাণী যাতে

কানে প্রবেশ না করে। কানের ছিদ্রের উপরে এক-একটি ঝিনুকাকৃতি পাখা সৃষ্টি করা হয়েছে, যা শব্দকে সংযত করে কানের ছিদ্রে প্রবেশ করতে সাহায্য করে। কানের পাখায় আল্লাহ্র এমন তীক্ষ্ণ অনুভূতি দান করেছেন যে, কোন ক্ষতিকর প্রাণী বা কোন কিছু কান স্পর্শ করা মাত্রই টের পায়। কানের ছিদ্রকে বক্র এবং পেঁচানো করে সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে শব্দ দীর্ঘ হয়ে ভিতরে প্রবেশ করে আর কোন কীট পোকা প্রভৃতি সহসা কানের ভিতরে ঢুকে পড়তে না পারে। পেঁচানো পথে ভিতরে যেতে বিলম্ব হয়। আর তা বের করা বা ধ্বংস করা সম্ভব হয়।

নাকের প্রতি লক্ষ্য কর! মুখমণ্ডলের মধ্যখানে উন্নত নাসিকাটি কি সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। তাঁর দুটি ছিদ্রে ঘ্রাণের অনুভূতি শক্তি সংরক্ষিত করা হয়েছে। যদ্বারা খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যের ঘ্রাণ অনুভব করা যায়। ইহার সাহায্যে লাভ করা যায় খোশবুর আনন্দ আর নাক বন্ধ করে রক্ষা পাওয়া যায় বদ্‌বু থেকে।

নাসিকার সাহায্যেই নির্মল বায়ু সেবন করে প্রাণকে সজীব করা সম্ভব হয়। আর দেহের অভ্যন্তরীণ তাপও এর ফলে বৃদ্ধি পায়। এই নাসারন্ধ্র মানুষের বহু প্রয়োজনে আসে। শব্দ নির্গমনে জিহ্বার সাহায্যে স্বর উচ্চারণ শ্বাস-প্রশ্বাস চলাচল এসব ব্যাপারে নাসারন্ধ্র কাজে আসে। কোন কোন লোকের নাসারন্ধ্র খুব সরু, আবার কারো কারো খুব বড়, কোনটি দীর্ঘ, কোনটি বা হ্রস্ব, এসব বিভিন্নতার কারণেই স্বরের তারতম্য হয়। এ কারণে দুজনের স্বর কখনও এক রকম হয় না। যেমন দু'জনের আকৃতি কখনও এক হয় না, তেমনি দু'জনের স্বর কখনও এক রকম হয় না। স্বর শুনে লোক চেনা যায়। যেমন চেনা যায় একজনের চেহারা দেখে। এই বিভিন্নতার মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্র সুনিপুণ কারিগরির নিদর্শন। এই বিভিন্নতা আল্লাহ্ রোজে আযল থেকেই করে রেখেছেন। হযরত আদম আর হাওয়ার আকৃতির মধ্যেও ছিল বিভিন্নতা, সেই বিভিন্নতা তাদের আওলাদের মধ্যেও চলে আসছে। আল্লাহ্র সুনিপুণ কুদরতের পরিচয় রয়েছে এই বিভিন্নতার মধ্যে। এই পার্থক্যের কারণে আমরা বেঁচে যাই বহু মুশকিল থেকে।

আল্লাহ্ মানুষকে দু'খানা হাত দিয়েছেন, যার প্রয়োজনীয়তা শুমার করা কঠিন। হাত দু'খানা দ্বারা মানুষ করে উপার্জন আর প্রতিরোধ করে দুশমন। চওড়া পাঞ্জা, পাঁচটি আঙ্গুল এক সারিতে তৈরী করেছেন। পঞ্চম বা বৃদ্ধাঙ্গুলি কিছু একটু দূরে; যা প্রত্যেকটি অঙ্গুলির সাথে যোগাযোগ রাখতে পারে। হাতের

এই গঠন নৈপুণ্যের পরিবর্তে দুনিয়ার সকল লোক একত্রিত হয়েও যদি হাতকে অন্য গঠনের তৈরী করার পরিকল্পনা করে, তা এর চেয়ে উত্তম ও কার্যকর রূপ কখনো সম্ভব হবে না। হাতের এই গঠনের সাহায্যে মানুষ যা কিছু ধারণ করতে, উঠাতে–নামাতে ও দিতে–নিতে পারে। হাতের তালু বিস্তার করলে হাতকেএকখানা থালার ন্যায় বানিয়ে নেওয়া যায়, আবার মুষ্টিবদ্ধ করে শত্রুকে আঘাত করা যায় বা ভয় দেখানো যায়। আবার অঞ্জলী বানিয়ে পানি পান করার কাজে ব্যবহার করা চলে। চলে তার দ্বারা চামচের কাজ, আবার ঝাড়ুর কাজও করা যায় হাত দ্বারা।

আঙ্গুলের মাথায় নখ সৃষ্টি করা হয়েছে। এতে যেমন বেড়েছে আঙ্গুলের সৌন্দর্য, তেমনি তা দিয়ে হেফাজত হয় আঙ্গুলগুলি। আবার কোন জিনিস হাতে তোলার ব্যাপারে নখের সাহায্য দরকার; নখ ব্যতীত মাটি থেকে ক্ষুদ্র জিনিসগুলি তোলা সম্ভব হতো না। শরীর চুলকাতে নখের সাহায্য নেওয়া হয়।

দেখ, নখ শরীরের কত ক্ষুদ্র অংশ এবং এটাকে খুবই নিকৃষ্ট বলে গণ্য করা হয় কিন্তু তারও বহু উপকারিতা রয়েছে।

আঙ্গুলের মাথায় যদি নখ না থাকে আর শরীরে খুব চুলকানি হয় তবে তার কি নাজেহাল অবস্থা হয়। নখের কার্যকারিতা কত ব্যাপক সুন্দর।

নখকে আল্লাহ্ না হাড়ের ন্যায় শক্ত না গোশতের ন্যায় নরম করে সৃষ্টি করেছেন। নখ বর্ধনশীল, ভঙ্গে পুনঃ জন্মে বেশী বেড়ে গেলে কেটে ফেলা হয়। নিদ্রায়, জাগরণে চুলকাতে হাত আপনা থেকে সেখানে যায়, আল্লাহ্ একে এই কার্যকারিতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন।

আল্লাহ্ মানব দেহের দুটি রান আর দু'খানি নালা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি প্রসারিত করা যায়। তার সাথে সৃষ্টি করেছেন দু'খানি পা। তার উপর ভর করে দাঁড়ান যায়, তার সাহায্যেই চলাফেরা করতে হয় আর দৌড়ানোর সময় দৌড়ানো যায়। পায়ের আঙ্গুলেও নখ রয়েছে, যার ফলে আঙ্গুলের শোভা বর্ধন হয়েছে আর হেফাজতের কাজও হয়ে থাকে। এসবই আল্লাহ্ মানবদেহের নাপাক বীর্য দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। শরীরের অস্থিগুলিও আল্লাহ্ সেই অপবিত্র বীর্যে তৈরী করেছেন। অস্থিগুলি দেহের খুঁটি স্বরূপ। তার উপর সারাটি দেহ নির্ভরশীল। অস্থিগুলির গঠন ও আকৃতি লক্ষ্য কর, তা কত রকমের বাঁকা, সোজা, লম্বা,

গোলাকৃতি নিরেট ফাঁপা, চওড়া, সরু, হালকা, আর ভারী প্রভৃতি নানা গঠনের অস্থি রয়েছে মানব দেহে। হাড়গুলির সন্ধিস্থলে রয়েছে এক প্রকার তরল লালার ন্যায় পদার্থ, যাতে করে অস্থিগুলি রক্ষা পায় আর উঠানামা ও বাঁকা–সোজা করা সহজ হয়। তাছাড়া সেগুলির রয়েছে আরো বহু উপকারিতা।

মানুষ জীবনের তাকিদে এবং নানা প্রয়োজনে তার দেহের মুখাপেক্ষী। তার দেহকে নানাভাবে সঞ্চালিত করতে হয়। আল্লাহ্ তার প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে অস্থি পৃথক পৃথক বহু খণ্ডে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন। যেন আবশ্যক মত অনায়াসে শরীর নাড়াচাড়া করা যায়। এসব অস্থি খণ্ড খণ্ড না হয়ে যদি সারা দেহে অখণ্ড একখানা অস্থি হতো তবে ওঠা–বসা চলাফেরা করা, বাঁকা হওয়া বা সোজা হওয়া হতো অসম্ভব। অস্থিগুলি পরস্পর সংযুক্ত করার জন্য শিরা–উপশিরা ও মাংসের ছাউনী দেয়া হয়েছে। অস্থিগুলি পরস্পর জুড়িয়ে রাখার জন্য উভয়টির প্রান্তদেশ মেলানযুক্ত করা হয়েছে, যাতে একটি অন্যটির সাথে উত্তমরূপে জুড়ে থাকতে পারে। মোটকথা, আল্লাহ্ এই অস্থিগুলিকে এমন নৈপুণ্য ও কৌশলে সংযোজিত ও সংগঠিত করেছেন যে, মানুষ দরকার মাত্রই তার দেহকে যেমন ইচ্ছা সঞ্চালিত করে নিজ কাজ সমাধা করতে পারে।

মানুষের মস্তকের গঠন লক্ষ্য কর। এটি মোট ১৫৫ খানা হাড়ের সমন্বয়ে গঠিত। অস্থিগুলি পরস্পর বিভিন্ন আকৃতির। আল্লাহ্ তার অসীম কুদরতে এগুলি এমনভাবে জুড়ে দিয়েছেন, যাতে গোটা মস্তকটি তৈরী হয়েছে। মাথার খুপড়ির অংশে ছয়খানি হাড় রয়েছে। উপরের অংশে ১২৪ খানা আর দু খানা নীচের জোড়ায়। বাকী দাঁতগুলি রয়েছে যদ্দারা খাদ্য–দ্রব্য পেষণ করা হয়। ঘাড়কে আল্লাহ্ মস্তকের দণ্ড হিসাবে তৈরী করেছেন, যা সাতখানা গোলা ফাঁপা হাড় দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি একটির উপর অপরটি রক্ষিত। এতে যে হেকমত আর কারিগরি রয়েছে, তা বর্ণনা করতে গেলে অনেক দীর্ঘ হবে। ঘাড়ের নিম্ন প্রান্ত পিঠের মেরুদণ্ডের উপর স্থাপিত। সেগুলি হচ্ছে ৩৪ খানি হাড়, যেগুলি একের পর এক কোমর পর্যন্ত প্রলম্বিত। কোমরে তিনখানা অস্থি রয়েছে। পিঠের অস্থি নীচের দিকে লেজ বিশিষ্ট হাড়ের সাথে যুক্ত। সেখানেও তিনটি অস্থি খণ্ডের গঠিত। পৃষ্ঠদেশের হাড়গলি পাঁজর, বক্ষ, কাঁধ, হাত্, পা ও নিতম্বের সাথে অতি নিপুণতার সাথে সংযোজিত। মানব দেহে মোট ২৪৮ খানা অস্থি রয়েছে।

অবশ্য ফাঁকা স্থান পুর্ণ করার জন্য যে ক্ষুদ্রাকৃতির হাড়গুলি রয়েছে তা এ হিসাবের বাইরে।

আল্লাহ্র অসীম কুদরত আর হেকমতের প্রতি লক্ষ্য কর। যিনি বীর্যের ন্যায় অপবিত্র পদার্থের দ্বারা এসব সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে আল্লাহ্র অপার মহিমা আর অসীম কুদরতের নিদর্শন। আল্লাহ্ যে নৈপুণ্য আর কৌশল দ্বারা মানব দেহ গঠন করেছেন, তাতে কোন হ্রাস বৃদ্ধির অবকাশ নেই। যদি তা হতো তবে তা হতো মানুষের পক্ষে কঠিন সমস্যা। চিন্তাশীলদের জন্য এতে রয়েছে মহাশিক্ষা ও আল্লাহ্র নিদর্শন। দেহের অভ্যন্তরভাগের গঠন নৈপুণ্য আর শৃঙ্খলার প্রতি মনোনিবেশ কর। দেহের অস্থিগুলি যাতে প্রয়োজনের সময় নড়াচড়া ও উঠানামা করতে পারে বাঁকা-সোজা হতে পারে আর এজন্য কতগুলি জিনিস সৃষ্টি করা হয়েছে, এগুলির সংখ্যা মোট ৫২৯। এগুলি মাংসপেশী ও ঝিল্লী দ্বারা গঠিত। এগুলি কোনটা ছোট, কোনটা বড়, কোনটা চওড়া আবার প্রয়োজনানুযায়ী কোনটা সরু। এর ২৪টি চোখের পলক সঞ্চালনে বিভিন্ন কাজে লাগে। যদি এর একটিরও কম হতো তবে চোখের কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো এবং দৃষ্টিশক্তি অকেজো হয়ে পড়তো। এমনি প্রত্যেক অঙ্গের জন্য বিভিন্ন অংশ রয়েছে। প্রয়োজনমত কোনটি ছোট আর কোনটি বড়। তারপর শিরা, উপশিরা, পেশী, ঝিল্লী প্রভৃতির সৃষ্টি সেগুলোর স্থান এবং তার ব্যাখ্যা আরো অধিক বিস্ময়কর। সে গুলির প্রকৃতির গুণাগুণ এবং কার্যকারিতা যা রয়েছে তা আমাদের জ্ঞানের অতীত।

এগুলির সৃষ্টি কৌশল আর অন্যান্য প্রাণী থেকে বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ মানুষকে সোজা ও সরল গঠনে সৃষ্টি করেছেন। যেন বসার সময়ও তার উত্তম গঠন ও আকৃতি বহাল থাকে। এ অবস্থায় সে দু'হাত দিয়ে অনায়াসে কাজ করতে পারে। অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় উপুড়মুখী করে আল্লাহ্ মানুষকে সৃষ্টি করেন নি। যদি অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় উপুড়মুখী করে সৃষ্টি করতেন, তবে তার পক্ষে অনেক কাজই করা সম্ভব হতো না।

মানব সৃষ্টির ভিতর বাহিরের প্রতি সার্বিকভাবে নজর কর। আল্লাহ্র কুদরতের বিস্ময়কর নিদর্শন রয়েছে তার গঠন নৈপুণ্যের মধ্যে। মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি কেমন নিখুঁত আর স্বয়ংসম্পূর্ণ। এক নির্দিষ্ট পরিমাণ আহারে তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি শক্তি সঞ্চয় করে। আল্লাহ্ মানব দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি এক

নির্দিষ্ট আকারে নিয়ন্ত্রিত করেছেন। খাদ্যের প্রাচুর্য ও আধিক্যের কারণে যদি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি অস্বাভাবিকভাবে লম্বা, স্থুল আর ভারী হতো তবে চলা-ফেরা এবং কাজ-কর্ম করা তার পক্ষে সম্ভব হতো না। এটা আল্লাহ্র অসীম দয়া আর অপার করুণা যে, তিনি মানুষের প্রত্যেকটি জিনিসকে পরিমিত ও নিয়ন্ত্রিত রেখেছেন, নতুবা তার জন্য ঘরবাড়ী, পোশাক-পরিচ্ছদ আর পানাহার সর্বক্ষেত্রেই সৃষ্টি হতো অচলাবস্থা। মানবদেহের প্রতি লক্ষ্য করি, আর তার গঠন নৈপুণ্যের কথা চিন্তা করি যে তার দেহে আল্লাহ্র কুদরতের কতো কারিগরি লুকায়িত রয়েছে।

অতঃপর আসমান, জমিন, চন্দ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি অগণিত সৃষ্টির মধ্যে তার কতো কুদরত, কতো হেকমত নিহিত রয়েছে তা ভেবে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সেগুলির আকৃতি, প্রকৃতি, বিভিন্ন গঠন, একটি থেকে আর একটির পার্থক্য ও ব্যবধান, মাশরিক মাগরিবের দূরত্ব প্রভৃতি সবই সেই সর্বশ্রেষ্ঠ কুশলীর স্রষ্টার অতুলনীয় কুদরত ও হেকমতের সাক্ষ্য। এসব লক্ষ্য করে বলতে বাধ্য হই যে, আসমান জমিনের একটি ক্ষুদ্র অংশও আল্লাহ্র কুদরতের আর সৃষ্টির বহির্ভূত নয়, বরং তার প্রতিটি অণু পরমাণুর মধ্যে সীমাহীন হেকমত নিহিত রয়েছে। সেগুলি আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অগোচর।

"হার অরকে দফ্তরিস্ মারিফাতি কিরদিগার।"
প্রতি পত্র পল্লবে রয়েছে আল্লাহ্র পরিচয়ের সাক্ষ্য।

আল্লাহ্ বলেনঃ

ءَانتُمْ اَشَدُّ خَلْقًا اَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا۔رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوّٰهَا۔

তোমাদের সৃষ্টি করা কঠিন না, না আসমান সৃষ্টি, তাকে উঁচু তারপর সমতল করা কঠিন কাজ? (সূরা নাজিয়াত)

যদি পৃথিবীর সকল মানুষ আর জ্বিন একত্রিত হয়ে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে বীর্য দ্বারা জীবন, শ্রবণশক্তি বা দর্শনশক্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করে তাদের পক্ষে তা কখনো সম্ভব হবে না। আল্লাহ্ তার অসীম কুদরতে মানুষকে মাতৃগর্ভে সৃষ্টি ও প্রতিপালন করেছেন তার আকৃতি দিয়েছেন এবং পরিমিত ও প্রয়োজনীয় অঙ্গ দান করেছেন। আর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির পরিমিত রূপ দান করেছেন। দেহের বাহির ভিতরে পুষ্টি সাধন ও বর্ধনের জন্য। খাদ্যের ব্যবস্থা এবং তা সুকৌশলে উদরে

প্রবেশের জন্য রাস্তা সৃষ্টি করেছেন। দেহের অভ্যন্তরে কিভাবে হৃদপিণ্ড, কলিজা, প্লীহা, জরায়ু, মুত্রাশয়, আঁত প্রভৃতি সৃষ্টি করেছেন। এগুলি আবার নির্দিষ্ট আকারে অবয়বে যথাস্থানে সংরক্ষিত করেছেন। সেগুলির প্রত্যেকটি নিজ নিজ কাজ করে যাচ্ছে। ফলে দেহ শক্তিলাভ করে টিকে থাকে।

খাদ্য পরিপাকের জন্য পাকস্থলীকে উত্তম উপদানের তৈরী করা হয়েছে। পাকস্থলীতে খাদ্যদ্রব্য সহজে পরিপাক হওয়ার জন্য তাকে দন্তের সাহায্যে মিহিন করে উদরে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যাতে পরিপাক করতে পাকস্থলীর উপর খুব বেশী চাপ না পড়ে। খাদ্যের সারাংশ দ্বারা রক্ত উৎপাদনের জন্য কলিজা কাজ করে থাকে আর প্রত্যেকটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গে খাদ্য পৌছায়। প্লীহা আর গুর্দা কলিজার কাজের সহায়ক। প্লীহার কাজ হচ্ছে রক্তে খাবার অংশ সংগ্রহ করা আর পীতকে রক্ত থেকে পৃথক করে ফেলা। গুর্দা খাদ্যের জলীয় অংশ সংগ্রহ করে প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে বের করে দেয়। কলিজা সারা দেহে রক্ত পৌছে দিতে সাহায্য করে। রক্তের সারাংশ যা মাংসের সারবস্তু থেকে সূক্ষ্ম আর নির্মল তা হৃদপিণ্ডে সঞ্চিত থাকে ঠিক যেন একটি পাত্রের ন্যায়, যাতে রক্তের সারাংশ সঞ্চিত থাকে আর প্রয়োজন মত দেহের বিভিন্ন অংশে বন্টিত হয়। এসবই আল্লাহ্‌র অপার কুদরত, যা চিন্তা করলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। আর সেগুলির পুর্ণ ব্যাখ্যা করা এবং অনুধাবন করা মানব শক্তির বাইরে।

গর্ভাশয় সৃষ্টি, তার মধ্যে সন্তান সৃষ্টি ও বৃদ্ধি, প্রয়োজন মতে সেখানে তার খাদ্য পৌছা—সবই আল্লাহ্‌র অসীম কুদরতের নিদর্শন। তারপর সন্তানের জন্য মায়ের প্রাণে ভালবাসা সৃষ্টি, যার কারণে সে সন্তান বুকে নিয়ে প্রতিপালন করে। আর এই ভালবাসার কারণেই মা সন্তানের প্রতি সহস্র প্রাণ কুরবান করতে এবং কষ্ট স্বীকার করতে রাজী। যদি আল্লাহ্ মায়ের প্রাণে সন্তানের জন্য এহেন দরদ সৃষ্টি না করতেন, তবে মা এত কষ্ট স্বীকার করতেন না এবং কষ্টের কারণে সন্তানের প্রতি বিরক্তি ও বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হতো। সন্তান যখন বড়ো হয়, তার অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ সবল ও শক্তিমান হয় তখন আল্লাহ্ তার মুখে দাঁত গজিয়ে দেন। তখন সে দুধ ছেড়ে অন্য খাদ্য খেতে শুরু করে। কেননা, দাঁত অন্য খাদ্য গ্রহণে তাকে সাহায্য করে থাকে। এভাবে সন্তানের মধ্যে ধীরে ধীরে বুদ্ধি ও চেতনা জাগ্রত হয়। এমনিভাবে একদিন তার জ্ঞান–বুদ্ধি পূর্ণতা লাভ করে।

আল্লাহ্‌র কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর, যখন সে পয়দা হয় তখন সে থাকে একেবারেই অবোধ ও অজ্ঞ। না থাকে তার জ্ঞান, না হুশ, না ভালমন্দ

বিবেচনার শক্তি। যদি জন্মের সাথে সাথে তার জ্ঞান হতো তবে দুনিয়ার এসব নতুন নতুন জিনিস দেখে সে তাজ্জব বনে যেত। তারপর সে তার নিজের প্রতি লক্ষ্য করত। কিভাবে তাকে নেকড়ায় করে কোলে তোলা হয়, কিভাবে দোলনায় রেখে প্রতিপালন করা হয়। অবশ্য তার দেহ কোমল আর নাজুক হওয়ার কারণে এসব কিছু তার জন্য প্রয়োজন। কিন্তু সাথে সাথে যদি শিশুর জ্ঞানোদয় হতো বহু বিষয়েই সে বিরোধ করত, অবাধ্য হতো এবং কলহ করত, এতে তার প্রতি মায়ের স্নেহমমতা হ্রাস পেত এমনকি তাকে যথারীতি প্রতিপালন করাই দুঃসাধ্য হতো। সুতরাং আল্লাহ্‌র হেকমতের বিধান এই যে, মানুষের জ্ঞান–বুদ্ধি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। আর ক্রমান্বয়ে সে দুনিয়ার সবকিছু সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে আর সচেতন হয়। শিক্ষা করে প্রত্যেকটি জিনিসের আবশ্যকতা ও ব্যবহার। যখন তার মধ্যে যৌন চেতনার উন্মেষ ঘটে, যা বংশ বৃদ্ধির কারণ বালকের মুখমণ্ডলে কেশ গজায় যাতে পুরুষ আর নারীর মধ্যে পার্থক্য সূচিত হয়। বিকশিত হয় তার অঙ্গে যৌবনের রূপ–লাবণ্য। আর যখন আসে বার্ধক্য তখন চেহারার রূপ–লাবণ্য যায় বিলীন হয়ে।

বালিকার চেহারাকে আল্লাহ্ করেছেন কেশমুক্ত। যাতে তার মুখমণ্ডলে যৌবনের কান্তি বিকাশ পেতে পারে আর পুরুষের জন্য তা হয় আকর্ষণীয়। ভবিষ্যৎ বংশ রক্ষার রহস্য এর ভিতর নিহিত রয়েছে।

সৃষ্টির এই শৃঙ্খলা আর কুদরতের মহিমা কি শুধুই বৃথা আর উদ্দেশ্যহীন। জ্ঞান কি একথা স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ যা তার অপার মহিমা আর কুশলতায় সৃষ্টি করেছেন তা এমনিই নিরর্থক সৃষ্টি? তা কখনও হতে পারে না। অবশ্যই এর পশ্চাতে মহান উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে, যা তার সৃষ্টির রহস্যের মধ্যে প্রচ্ছন্ন।

যখন মাতৃগর্ভে সন্তান স্থিত হয় তখন যদি সে রক্তের সারাংশ খাদ্য হিসাবে না পেত তবে সে কি গর্ভে শুকিয়ে মরতো না? যেমন পানির অভাবে তরু–লতা শুকিয়ে মরে যায়।

গর্ভে সন্তান পূর্ণতা লাভের পর যদি প্রসুতি প্রসব বেদনায় অস্থির না হতো আর যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ট না হতো মা ও সন্তান উভয়েই মৃত্যুমুখে পতিত হতো। সন্তান ভূমিষ্ট হওয়ার পর যদি শিশু প্রয়োজনীয় খাদ্য দুধ ইত্যাদি না পায় তবে শিশু কি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় মারা যাবে না? যদি যথাসময়ে শিশুর দাঁত না

গজায় আর শক্ত দ্রব্য গিলে গিলে খেতে শুরু করে তবে তা হজম করতে না পেরে রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়বে। যদি ছেলের মুখে যথাসময়ে কেশ না গজাবে তবে তা দেখতে হতো মেয়ের মতো আর বালকের মতো। দাড়ি না হলে চেহারারার সৌন্দর্য, সৌম্যতা আর গাম্ভীর্য ফুটে উঠত না। এসবই মহীয়ান আল্লাহ্র অশেষ দান আর অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই সম্ভব নয়।

চিন্তা কর, মানুষের যৌন চেতনা কিভাবে সৃষ্টি হয়? পুরুষাঙ্গ কিভাবে জরায়ুতে বীর্য দান করে এবং সেই উত্তেজনা যাহা ধমনী হইতে বীর্য নিসঃরণ করার জন্য সৃষ্টি হয়।

অনুরূপভাবে ইহার বিপরীত বা স্ত্রী–যোনী এবং উহার কার্যকারিতা লক্ষ্য কর। এইরূপ মানব দেহের প্রতিটি কাজের প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ দেহের প্রতিটি অঙ্গ কি কাজের উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলি কিভাবে যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে এবং সে কাজের উদ্দেশ্য, তার গঠন ও আকৃতি দান করেছে। চক্ষু দেখার জন্য, হাত স্পর্শ করার ও ধারণ করার জন্য, পা চলাফেরার ও দৌড়ানোর জন্য, পাকস্থলী খাদ্য পরিপাক করার জন্য, কলিজা উদরের পরিপাক করা খাদ্যের পরিত্যক্ত অংশ ছাঁকার জন্য এবং প্রয়োজন মত তা বন্টন করার জন্য, মুখ আহার করার এবং কথা বলার জন্য। মোট কথা, তুমি দেহের প্রতিটি বিষয় যখন চিন্তা করবে,তখন বুঝতে পারবে যে, ইহা আল্লাহ্র অসীম কুদরতেরই প্রতিবিম্ব।

চিন্তা কর, ভুক্তদ্রব্য পাকস্থলীতে পৌছার পর কিভাবে উহা পরিপাক হয়। খাদ্যের সারাংশ হৃৎপিণ্ডে পৌছাইয়া দেয়। উহা সূক্ষ্ম তন্ত্রীর সাহায্যে হৃৎপিণ্ডে গিয়ে উপস্থিত হয়। স্নায়ুতন্ত্রীগুলিকে সূক্ষ্ম করে সৃষ্টি করা হয়েছে যেন খাদ্যে নির্দোষ পদার্থ ব্যতীত কোন দূষিত পদার্থ হৃদপিণ্ডে গিয়ে না পৌঁছে যা দেহের পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে এই সূক্ষ্ম তন্ত্রীগুলি প্রায় ঝিল্লীর স্থলবর্তী। এগুলি পরিপাক খাদ্যদ্রব্য ছেঁকে প্রয়োজনীয় ও বিশুদ্ধ অংশ হৃৎপিণ্ডে পৌছে দিতে পারে। হৃৎপিণ্ড একে রক্তে পরিণত করে। আল্লাহ্র হেকমতে খাদ্যদ্রব্য এভাবেই রক্তে পরিণত হয়। এখন থেকে রক্ত সূক্ষ্মতন্ত্রীর সাহায্যে সর্বাঙ্গে সরবরাহ হয়। খাদ্যের সারাংশ এভাবে উৎপন্ন হওয়ার পর অবশিষ্ট যে নিকৃষ্ট পদার্থ থেকে যায়, তা যে যে অঙ্গের সেগুলি সেখানে পৌছে বাকী মল–মূত্ররূপে যথাস্থানে সঞ্চিত হয়। হৃদপিণ্ড যেন দেহের সেরা পাত্র, সেখানে দেহের জন্য উৎকৃষ্ট খাদ্য সঞ্চিত হয় আর দরকার মতো তা সর্বত্র সরবরাহ হয়।

মানুষের দেহের এমন একটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গও দেখা যায় না, যা অনাবশ্যক বা যার সৃষ্টি অর্থহীন।

চক্ষু আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন দেখার জন্য আর প্রত্যেকটি জিনিস চেনার জন্য। রূপ–রং এর পার্থক্য, ছোট–বড়ো, উঁচু–নীচুর ব্যবধান চক্ষু না হলে করা সম্ভব হতো না। এই যে আলো, যদি চোখের দৃষ্টিশক্তি না থাকতো তবে কি কাজে আসতো এ আলো? আলো থাকলেই তবে চোখের কাজ। কারণ আলোর সাহায্যে চোখ দেখতে পায়। বিভিন্ন রং–এর সৃষ্টি এজন্য যে, চোখ বিভিন্ন রং এর পার্থক্য অনুভব করতে পারে।

কান আল্লাহ্ এজন্য সৃষ্টি করেছেন যে, তার সাহায্যে শব্দ শুনা যায়। যদি শব্দ হতো আর কান তা শ্রবণ করতে না পারত বা কানই আদৌ না হতো তবে শব্দের উপকারিতা কি ছিল? এমনি প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের প্রয়োজনীয়তা। ইন্দ্রিয় আর অনুভূতির মধ্যে এমন সম্পর্ক যে, ইন্দ্রিয় ব্যতীত অনুভূতি অর্থহীন আলো আর বায়ুরও ঠিক সেই একই অবস্থা। যদি আলো না থাকত তবে দর্শনেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে পড়তো। যদি বায়ু না থাকত তবে কানে শব্দই পৌছতো না।

অন্ধ আর বধিরের অসুবিধা চিন্তা করে দেখ। আল্লাহ্র এ দু'টো নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থাকার কারণে তাদেরকে কি কি মুসিবত ভুগতে হয়। অন্ধ যখন পা ফেলে চলতে থাকে তখন সে জানে না কোথায় তার পা পড়বে। সে বিপজ্জনক গর্তেই পা ফেলছে, না কোন অনিষ্টকর প্রাণীর উপরই পা ফেলছে অথবা তার সামনে কি রয়েছে সে তার কিছুই জানে না। সামনে থেকে যদি কোন মহা আপদ–বিপদও আসতে থাকে তাও তার দেখবার উপায় নেই। সৃষ্টির বহু দান অবদান থেকে সে বঞ্চিত। এই রূপ রং এর দুনিয়াও তার কাছে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। কালো, সাদা, লাল, হলদে তার কাছে সবই সমান।

শ্রবণ শক্তি থেকে যে বঞ্চিত সে বেচারা তো কথার মাধুর্যই অনুভব করতে পারে না। শব্দে যে একটা মাধুর্য আর আকর্ষণ রয়েছে তা সে উপভোগ করতে পারে না। হৃদয়গ্রাহী শব্দ অথবা কর্কশ ও অপ্রিয় শব্দের মধ্যে পার্থক্য করার সাধ্যও তার থাকে না! কানে শব্দ প্রবেশ করলেই তার তারতম্য অনুভব করা সম্ভব হতে পারে, কিন্তু যে বধির সে তো তার কল্পনা করতে পারে না। কোন লোক সভায় বসা থাক বা কেউ তাকে লক্ষ্য করে কিছু বলুক সবই সমান। সে মজলিসে উপস্থিত থেকেও অনুপস্থিত, জীবিত থেকেও সে মৃতপ্রায়।

আবার যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নেয়ামত জ্ঞান থেকে বঞ্চিত, অর্থাৎ উন্মাদ পাগল তার অবস্থা তো পশু থেকেও নিকৃষ্ট। পশু তো ভালমন্দ কতকটা পার্থক্য করতে পারে কিন্তু পাগল তাও পারে না, কেননা সে জ্ঞান থেকেই বঞ্চিত।

এবার আল্লাহ্ প্রদত্ত অঙ্গ–প্রত্যঙ্গগুলির প্রতি সামগ্রিকভাবে নজর কর আর মানুষের শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শ, স্বাদ গ্রহণ প্রভৃতি শক্তির প্রতি লক্ষ্য কর, যার সাহায্যে সে জীবনের যাবতীয় প্রয়োজন মিটায়। যদি এসব শক্তির একটির অভাব হতো তবে তার কাজকর্মে সৃষ্টি হতো দারুণ বাধা বরং তা হতো তার জন্য একটা বিরাট দুর্ঘটনা।

আল্লাহ্ যাকে তার কোন একটি ইন্দ্রিয় থেকে বঞ্চিত করেছেন, সে নিশ্চিতভাবে নিদারুণ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। এসব নেয়ামতের কি মূল্য তা সে এ অভাবের দ্বারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে। অতঃপর তার ধৈর্য অবলম্বন করা ব্যতীত আর করার কি থাকে? এই অভাবের ফলে তার জীবনে যেসব বিপদ আর মুসিবত দেখা দেবে তা ধৈর্যের সাথে সহ্য করে যেতে হবে যাতে সে আখেরাতে তার বিনিময়ে আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান লাভ করতে পারে।

আল্লাহ্‌র কুদরত আর রহমত লক্ষ্য কর। সর্বাবস্থায়ই তিনি তার বান্দার প্রতি দয়ালু। দান করার ক্ষেত্রে বান্দার কৃতজ্ঞতার জন্য আর বঞ্চিত করার বেলায় সবরের জন্য আল্লাহ্ পুরস্কৃত করবেন। মানুষের অঙ্গগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। কোন অঙ্গ একটি মাত্র আর কোন অঙ্গ দু'দুটি। সে গুলির কাজ আর দায়িত্বের প্রতি লক্ষ্য কর, কিভাবে সেগুলি নিজ নিজ কাজ ও দায়িত্ব পালন করছে। মস্তকের প্রতি নজর কর, উহা মাত্র একটি। কিন্তু কত কাজ আর দায়িত্ব তার প্রতি ন্যস্ত। এগুলি ছাড়া যদি মস্তকের উপর অতিরিক্ত কোন চাপ পড়ে তবে তার প্রতি তা খুবই ভারী হয়ে পড়ে। মাথা যদি একটির পরিবর্তে দুটো হতো তবে একটি কথা বলার সময় অন্যটি নিষ্ক্রিয় থাকতে হতো আর যদি উভয় মিলে একটি কথা বলতো তবুও একটি বেকার থাকতো। আর যদি এক মস্তক এক কথা বলতো অন্যটির অন্য কথা আর দুটির মধ্যে বিভিন্নতা তবে বিষম সমস্যার সৃষ্টি হতো। কোনটি আসল কথা তা বোঝা দুঃসাধ্য হতো।

কিন্তু হাতের অবস্থা ভিন্ন। আল্লাহ্ মানুষকে দু'খানা হাত দিয়েছেন। হাত যদি একখানি মাত্র হতো তবে কাজ করতে ভারী অসুবিধা দেখা দিত। বস্তুতঃ হাত দু'খানা হওয়াই অপরিহার্য। যার এক হাত পঙ্গু বা বেকার তাকে জিজ্ঞাসা

করলেই বোঝা যায় তার কাজ করতে কি অসুবিধা। এক হাতওয়ালা কোন অবস্থায়ই দু'হাত ওয়ালার মতো কাজ করতে পারে না। তারপর কষ্ট আর অসুবিধার কথা তো রয়েছেই।

এমনি দু'পা হওয়ারও যৌক্তিকতা সুস্পষ্ট। যদি তা না হতো তবে মানুষ চলতেই পারতো না।

শব্দ সৃষ্টির অঙ্গটির গঠন নৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য কর। আবার জিহ্বা, ওষ্ঠদ্বয় ও দাঁত বর্ণ এবং শব্দকে বর্ণে ও কথায় পরিণত করার কাজে সাহায্য করে থাকে। মুখে যদি এগুলো না থাকতো তবে আওয়াজ নষ্ট ও অকেজো হয়ে যাওয়ার দরুন কথা বলার কেমন অসুবিধা আর বিপর্যয় সৃষ্টি হত। আর শ্বাসনালী শব্দ বের করা ছাড়াও বায়ু ফুসফুস পর্যন্ত নিয়ে যায়। যাতে হৃৎপিণ্ডেরও আরাম হয়। যদি এই নালীর ব্যবস্থা না থাকত অথবা কিছু সময় তা বন্ধ করে রাখা হতো তবে হৃৎপিণ্ড অস্থির হয়ে পড়ত।

জিহবা দ্বারা খাদ্য গ্রহণে সাহায্য হয়। দাঁত দিয়ে খাদ্য চর্বণ ও পেষণে সাহায্য হয়। ওষ্ঠদ্বয় দ্বারা খাওয়া আর পান করার সহায়তা হয়ে থাকে। আর মুখের জন্য ওষ্ঠ দুটি কবাটের কাজ করে থাকে। এসব বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, মানুষের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গগুলি অসংখ্য কাজে এসে থাকে। যদি এতে কিছু মাত্র কমবেশী হত তবে তার কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো আর অসম্ভব হয়ে পড়তো অনেক কাজ। সুতরাং আল্লাহ্ প্রতিটি অঙ্গ চূড়ান্ত নৈপুণ্য আর জ্ঞানের ভিত্তিতে সৃষ্টি করেছেন। মগজের প্রতি লক্ষ্য কর। যদি তা খুলে ফেলা হয়, তবে দেখা যাবে পরস্পর খুব নিবিড়ভাবে সন্নিহিত, যাতে হঠাৎ কোন আঘাত পেলে তা থেকে রক্ষা পায়। এর উপরে রয়েছে খুপড়ির ঢাকনা, তা আবার কেশ দ্বারা আচ্ছাদিত যাতে মস্তকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর শীত গ্রীষ্ম থেকেও বেঁচে থাকা যায়। দেখ, আল্লাহ্ মগজের হেফাজতের জন্য কি কি ব্যবস্থা করেছেন। মগজের ন্যায় কোমল নাজুক জিনিস আল্লাহ্ কি উত্তমভাবে রক্ষা করেছেন, যা সকল অনুভূতির মূল। মস্তিষ্ক ছাড়া সকল অনুভূতিই অকেজো।

হৃৎপিণ্ড দেখ, উহা বুকের বদ্ধ খাচায় কিভাবে সংরক্ষিত। তার উপরে রয়েছে ঝিল্লীর পর্দা আর তার চতুর্দিক গোশত আর শিরা–উপশিরা দ্বারা সংরক্ষিত করা হয়েছে। দেহের মধ্যে এটিই সর্বপ্রধান অংশ। এটি দেহ রাজ্যের বাদশাহ, এজন্যই একে এভাবে সুরক্ষিত করে রাখা প্রয়োজন।

হলক অর্থাৎ গলা দেখ! তাতে দুটি রাস্তা রয়েছে। একটি শব্দ বের হবার জন্য, যাকে শ্বাসনালী বলে, এটি ফুস্ফুস্ পর্যন্ত প্রসারিত। দ্বিতীয়টি খাদ্যনালী, এটি পাকস্থলী পর্যন্ত প্রলম্বিত। গলায় একটি পর্দা রয়েছে, যাতে খাদ্য ফুস্ফুসে প্রবেশ করতে না পারে। আর ফুস্ফুস্কে পাখার ন্যায় তৈরী করা হয়েছে, যা হৃৎপিণ্ডকে বায়ু দ্বারা সজীব রাখে আর উত্তাপ ও বদ্ধতার জন্য তার কাজে বাধার সৃষ্টি না হয়। আর বায়ুর অভাবে হৃৎপিণ্ড নিষ্ক্রিয় হয়ে মানুষের জীবন নাশের কারণ না হয়। এ কারণে ফুস্ফুসের ভিতরের ফাঁকা স্থান বায়ুপূর্ণ থাকে যাতে হৃৎপিণ্ড সর্বদা বায়ু লাভ করতে পারে।

পেশাব পায়খানার রাস্তার প্রতি লক্ষ্য কর! আল্লাহ্ কি কৌশলে আর নিপুণতার সাথে তা তৈরী করেছেন। তা কেবল প্রয়োজনের সময় কাজ করে অর্থাৎ প্রস্রাব পায়খানার বেগ হলে তখনই তার কাজ, অন্য সময় তা থেকে কিছু নিঃসৃত হয় না। যদি সর্বাবস্থায় তা থেকে মলমূত্র নির্গত হতে থাক্‌ত তা হলে জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠতো আর মানুষ কখনও পাক পবিত্র থাকতে পারত না। দেখ আল্লাহ্ মানুষের রানদ্বয় আর নিতম্ব কিভাবে তৈয়ার করেছেন। তাতে স্থূল সুপুষ্ট মাংস রয়েছে। যাতে লোকের বসার বেলায় কোন কষ্ট না হয়। মাংসবিহীন শীর্ণ ও ক্ষীণ মানুষের বসায় কষ্ট হয়। তাই এ'দুটি নরম গদির ন্যায়।

মানুষের লিঙ্গের প্রতি লক্ষ্য কর (লজ্জার কথা নহে, এটাও আল্লাহ্ বিশেষ উদ্দেশ্যে করেছেন)। যদি তা সর্বক্ষণ শিথিল আর ঢিলা থাকত তবে মানুষের পক্ষে গর্ভাশয়ে বীর্য ক্ষেপণ করা কি করে সম্ভব হত? আর যদি সর্বাবস্থায় তা উত্তেজিত থাকত তবে তা হতো ভারী অসুবিধাজনক। এজন্য আল্লাহ্ তাকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, যথাসময়ে তা দৃঢ় ও উত্তেজিত হয়, অন্য সময় নিঃসাড় শিথিল হয়ে থাকে যেন এর অস্তিত্বই নেই।

গৃহের বা বাড়ীর মধ্যে পায়খানা করার স্থান সবচেয়ে অধিক আবৃত আর নির্জন হয়ে থাকে। কেননা মানুষ সেখানে গিয়ে হাজত সেরে অস্বস্তি আর উদ্বেগ থেকে উদ্ধার পায়। সেখানে সে উলঙ্গ হয়ে বসে। আল্লাহ্র কি হিকমত দেখ, তিনি মলদ্বারকে দেহের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রচ্ছন্ন স্থানে সৃষ্টি করেছেন, তারপর মাংসল রান দ্বারা তাকে আরও প্রচ্ছন্ন করা হয়েছে যেন উলঙ্গ হলেও অনেকটা ঢাকা থাকে।

কেশ আর নখের প্রতি নজর করে দেখ, সেগুলি বর্জনশীল। সেগুলি কেটে ফেলার মধ্যেও রয়েছে যুক্তি আর কল্যাণ। আল্লাহ্ নখ আর কেশ অনুভূতিহীন করেছেন, যাতে তা কর্তন করার সময় কষ্ট না হয়! যদি তাতে অনুভূতি থাকত তবে হয়তো বেদনা বা কষ্টের ভয়ে তা কাটা হতো না। ফলে, তা অনেক বড় হয়ে দেখতে বন্য জন্তুর মতো হতো।

তারপর কেশ গজাবার স্থানগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। যদি চোখের ভিতরেও কেশ গজাতো তাতে মানুষ যেত অন্ধ হয়ে। কেননা, চোখের ন্যায় নাজুক আর সূক্ষ্ম অঙ্গ তা সহ্য করতে পারত না; যদি মুখের ভিতরে লোম হতো তাতে পানাহারের হতো নিদারুণ অসুবিধা আর স্বাদ যেত বরবাদ হয়ে। এমনি যদি হাতের তালুতে লোম হতো তবে স্পর্শ করা, ধরা প্রভৃতির আরাম হতে মানুষ বঞ্চিত হতো। আর তাতে বিঘ্ন সৃষ্টি হতো অনেক কাজে। এমনি যদি নারীর যোনীর অভ্যন্তরে লোম হতো তবে স্ত্রী সম্ভোগের সুখ হতে বঞ্চিত হতে হতো। এসব ব্যাপারে আল্লাহ্র কুদরতের প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি প্রত্যেকটি জিনিস যথাস্থানে তৈরী করে মানুষের শান্তির ব্যবস্থা করেছেন। কোন অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বা জিনিস এমনভাবে সৃষ্টি করেন নাই যাতে মানুষের অশান্তি আর কাজে বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ মানবদেহে পানাহার, নিদ্রা আর সহবাসের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করেছেন আর সেগুলির চাহিদা আর অনুভূতিও সৃষ্টি করেছেন।

আহার পানীয়ের চাহিদার সময় তৃষ্ণার সৃষ্টি হয়। পানাহার মানুষের জীবন ধারণের জন্য একান্ত প্রয়োজন।

নিদ্রাও মানুষের জন্য প্রাকৃতিক দাবী। নিদ্রা ব্যতীত মানুষের দেহ মনে শান্তি হয় না এবং শরীরে নতুন শক্তি ও কার্যোৎসাহ সৃষ্টি হয় না। দিবা রাত্রির মধ্যে কিছুক্ষণ নিদ্রা ভোগ করার পর তার দেহমনে আরাম, স্বস্তি আর নতুন কর্মশক্তি ফিরে আসে।

সহবাসের জন্য আসক্তি ও কামোদ্দীপনা হচ্ছে আমন্ত্রণ আর আহবান। যা বংশধারা রক্ষার জন্য অপরিহার্য। যদি কামাশক্তির উদ্রেক না হতো তবে মানুষ অন্য কাজে লিপ্ত থাকত আর বংশ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা ভুলে যেত। এভাবে তার দৈহিক শক্তি হ্রাস পেত আর অবসাদ এসে বংশধারা বিলুপ্ত করে দিত।

দেখ, সহবাসের উদ্দেশ্য যদি শুধুমাত্র বংশরক্ষা হতো তবুও বংশ লোপ পেয়ে

যেত; কেননা এমন অনেক প্রতিবন্ধকতা দেখা দিত যার কারণে মানুষ উৎসাহী হতো না, ফলে তা বংশ বিলুপ্তির কারণ হতো। আল্লাহ্‌র হিকমতের প্রতি লক্ষ্য কর, তিনি মানুষের প্রকৃতিতে এমন কামোত্তেজনা দান করেছেন, যার কারণে মানুষ সহবাসের জন্য উদগ্রীব হয়, যার ফলে পরোক্ষভাবে সন্তান সৃষ্টি হয়।

দেহের বিন্যাস ও গঠনের প্রতি লক্ষ্য কর। দেহ যেন একটি রাজ্য, যেখানে চাকর কর্মচারী স্ব স্ব কর্মে নিয়োজিত। একের প্রতি এক কাজ ন্যস্ত রয়েছে তো অন্যে তার সহায়তায় হাজির। গৃহে যদি কোন ময়লা আবর্জনা সঞ্চিত হয় তবে নিয়োজিত খাদেম তা তৎক্ষণাৎ বের করে দিয়ে গৃহকে পরিষ্কার করে ফেলে। মনে কর বাদশাহ্‌তো সেই স্রষ্টা যিনি সব কিছু সৃষ্টি করেছেন। আর মানবদেহ প্রাসাদ সদৃশ। দেহের হাত, পা, নাক, কান, চক্ষু এগুলি কর্মচারী বা সেবক তুল্য। যদি এগুলির মধ্যে একটিও কম হয়, তবে দেহের শৃঙ্খলা বিপর্যয় হয়ে যাবে। লেন-দেন, দেখা-শুনা, চলাফেরা, প্রভৃতি সব কাজই এলোমেলো হয়ে যাবে! না রাস্তা চিনে চলাফেরা করতে পারবে, না জ্ঞান দ্বারা উপকৃত করতে পারবে, না বাঁচাতে পারবে নিজেকে ক্ষতি থেকে। মোটকথা, কোন একটির অভাব হলে সব কাজই বন্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং মানব দেহে আল্লাহ্‌ যেসব নেয়ামত দান করেছেন সেগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, যদি এগুলি না থাকে তবে মানব জীবনই অকেজো আর ব্যর্থ হয়ে যাবে।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কৌশলের প্রতি লক্ষ্য কর। স্মৃতিশক্তি নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র প্রতি বড় নিয়ামত। আবার বিস্মৃতি—অর্থাৎ ভুলে যাওয়া এটাও আল্লাহ্‌র একটা নিয়ামত, একটা বিশেষ অনুগ্রহ। এতে বিরাট রহস্য নিহিত। যদি মানুষের মধ্যে ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা না থাকত তবে মানুষ অনবরত দুঃখ-শোকে জর্জরিত থাকত আর দুঃখ-কষ্টে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠতো। ফলে দুনিয়ার সব আনন্দ আর সুখ তার কাছে বিস্বাদ হতো। কোন কিছুতেই সে স্বাদ বা আনন্দ পেত না। কেননা, দুঃখ-কষ্টে তার মন এতই নিমগ্ন থাকত যে জীবনের প্রতিই সে বিমুখ হয়ে পড়ত। জালেমের অত্যাচার, হিংসুকের হিংসা ও দুর্ব্যবহার প্রভৃতি সর্বদা তার হৃদয়ে জাগরিত থেকে জীবনকে দুর্বিষহ করে রাখত। তাই দেখ, আল্লাহ্‌ স্মৃতি আর বিস্মৃতি দুইটি পরস্পর বিরোধী গুণ মানুষের মধ্যে দান করেছেন। আর দুটোর মধ্যে রয়েছে বহু কল্যাণ আর রহস্য।

আবার দেখ মানব চরিত্রে আল্লাহ্‌ এমন কতগুলি বিশেষ গুণ দান করেছেন, যেগুলো অন্য প্রাণীর মধ্যে নেই। যেমন লজ্জা, যা আল্লাহ্‌ একমাত্র মানুষকেই দান করেছেন। যদি মানুষের মধ্যে লজ্জা ও কুণ্ঠা না থাকত তবে সে গুনাহর কাজ থেকে কখনও বিরত হত না। কর্তব্য কাজ করত না, অতিথি মেহমানের কদর করত না, ভালো কাজে আগ্রহী হত না। আর মন্দ কাজ থেকে সরে থাকত না। কেননা অনেক কাজই লোক শরমের ভয়ে করে থাকে। আমানত আদায় করে, পিতামাতার সেবা করে, লজ্জাজনক কাজ থেকে ফিরে থাকে এসব কাজ বহু সময় লোকলজ্জার খাতিরে করে থাকে। সুতরাং দেখ, লজ্জার উপকারিতা আর বেহায়াপনার অপকারিতা কত। অন্যান্য বহু স্বভাবের কথা এভাবে চিন্তা করে দেখ। বাকশক্তি চিন্তা করে দেখ, এর কারণে মানুষ সকল প্রাণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ। বাকশক্তির সাহায্যে সে তাহার মনের ভাব প্রকাশ করতে সক্ষম হয় আর তা অন্যকে বোঝাতে পারে। এমনি অন্যের কথাও বুঝতে পারে। যদি আল্লাহ্‌ মানুষকে এসব গুণ না দিতেন তবে পরস্পর ভাবের আদান-প্রদান কিভাবে সম্ভব হতো?

এমনি লেখনী শক্তির বিষয়ে চিন্তা কর, যার সাহায্যে আজ আমরা হাজার হাজার বৎসর পূর্বের ইতিহাস ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কথা জানতে পারি। আবার সহস্র সহস্র বৎসর পরে লোক আমাদের কথা জানতে পারবে এই লেখার সাহায্যে। সাহিত্য, ইতিহাস, গণিত প্রভৃতি শাস্ত্র সংরক্ষিত হয়ে আসছে। ভুলে যাওয়া জ্ঞান আমরা পুস্তকের সাহায্যে শিখে নেই, পুনঃ ইয়াদ করি। যদি আল্লাহ্‌ আমাদের লেখার কৌশল শিক্ষা না দিতেন তবে আমরা পূর্ববর্তীদের জ্ঞান-বিদ্যা কিছুই হাসিল করতে পারতাম না, আর যা কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান সব ধ্বংস হয়ে যেত। এমনকি, মূর্খ ও বর্বর জীবনই আমাদের যাপন করতে হত। ফলে সমাজ, রাষ্ট্র প্রভৃতি সব ক্ষেত্রে সৃষ্টি হতো মহাসংকট।

অবশ্য বলা যেতে পারে যে, লেখা প্রভৃতি মানুষের সৃষ্ট শিল্প, এটা কোন প্রকৃতিগত বিষয় নয়। কেননা, পৃথিবীতে আরবী, রোমান ও অন্যান্য বিভিন্ন ভাষা রয়েছে। লেখায়ও তেমনি বিভিন্নতা দেখা যায়।

এখানে আমাদের বলার উদ্দেশ্য লেখার শক্তি। অর্থাৎ হস্ত ও অঙ্গুলির সাহায্যে বর্ণমালা লেখার শক্তি লাভ। সে শক্তি খোদারই দান।

এমনি কথা বলার বেলায় যদি মন ও চিন্তা ধারাবাহিক না হতো তবে মানুষ কথা বলতেই পারতো না। সুতরাং দেখ, আল্লাহ্ মানুষকে কি নিয়ামত দান করেছেন।

অতঃপর লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ মানুষকে ক্রোধ দান করেছেন। এর দ্বারা সে শত্রু, আর অনিষ্টকর দ্রব্য থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সচেতন হয়। আর হিংসাবৃত্তির দ্বারা নিজ স্বার্থ অর্জন করে। তবে এই ক্রোধ আর হিংসাবৃত্তিকে নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে ব্যবহার করার প্রতি আল্লাহ্র নির্দেশ রয়েছে। কেননা এর যে কোন স্বভাব যদি সীমা অতিক্রম করে তবে তা হবে নিশ্চিতভাবে শয়তানী স্বভাব। ফলে সে আল্লাহ্ থেকে হয়ে পড়বে দূরে। ক্রোধের বশবর্তী হয়ে যখন সে কোন অন্যায়ের বিরুদ্ধে কাজ করতে অগ্রসর হবে তখন তাকে খুব সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। তবে হিংসাবৃত্তিকে দমন করে ঈর্ষা করতে পারে। কেননা হিংসার অর্থ হচ্ছে অন্যের ক্ষতি আর নিজের স্বার্থ কামনা করা আর ঈর্ষার বেলায় অন্যের ক্ষতির কামনা হয় না বরং তার সমকক্ষতা বা তদপেক্ষা ভাল হওয়ার প্রেরণা অনুভব করে।

আল্লাহ্ তাঁর অসীম কুদরত ও হিকমতে মানুষকে কতকগুলি উপকারী জিনিস দান করেছেন আর কতগুলি থেকে বিরত রেখেছেন। এতে রয়েছে মানুষের অশেষ উপকার আর কল্যাণ।

আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে আশা-আকাঙক্ষা দান করেছেন, যার ফলে সংসার আবাদ রয়েছে আর বংশধারা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই কারণে অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও গরীব লোকেরা শক্তিমান আর সম্পদশালী লোক থেকে স্বার্থ লাভ করে থাকে। শক্তিমান লোক দুনিয়াকে আবাদ করেছে, শহর নগরী রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছে আর এসব কাজে দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা পরোক্ষভাবে অসংখ্য স্বার্থ লাভ করছে।

মানুষকে প্রকৃতিগতভাবে দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি পূর্ব-পুরুষ কর্তৃক নির্মিত বাড়ী ঘর দালান কোঠা ও শিল্প দ্রব্যাদি না দেখত তবে তাদের ঘর-বাড়ী তৈরী হতো না বা তাদের কাছে এমন কোন কিছুই ছিল না, যা দ্বারা তারা তাদের প্রয়োজন মিটাতে পারত। সুতরাং তাদের আশা-আকাঙক্ষা তাদের কর্মেরই পটভূমি। এসব দেখে শুনে তাদের কর্মের উৎসাহ উদ্দীপনা দৃষ্টি হয়, আবার পরবর্তী লোক তাদের বংশধরদের জন্য এতসব রেখে যাবে, যার দ্বারা

তারা জীবনের অসংখ্য উপকার লাভ করবে। আবহমান কাল ধরে এই ধারা অব্যাহতভাবে চলতে থাকবে। এসব মানুষের ভিতরে সৃষ্টিগত আশারই সুফল।

আবার কতগুলি বিষয় আল্লাহ্ মানুষের অগোচর ও অজ্ঞাত রেখেছেন যেমন তার আয়ু আর মৃত্যুর খবর। যদি মানুষ তার আয়ুর খবর জানত আর তা হতো সংক্ষিপ্ত তবে তার জীবনের স্বাদ ও আশা বিস্বাদে ভরে যেত আর দুনিয়ার কোন কাজ কর্মেই তার মন উঠতো না, এমনকি বংশ রক্ষা অথবা ঘর-দোর নির্মাণের ব্যাপারে তার মোটেই কোন উদ্যোগ-উৎসাহ থাকতো না। আর যদি তার আয়ু কাল খুব দীর্ঘ হতো আর সে তা জানতো, তবে সে হয়ে পড়তো প্রবৃত্তির দাস, আর খোদার নির্ধারিত সীমা লংঘন করতো, নানা দুষ্কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়তো কেননা মনে করতো তার মৃত্যু তো অনেক দূরে। ফলে সে ভুলে যেত তার মৃত্যুর কথা। সুতরাং আল্লাহ্ এই বিষয়টি মানুষের কাছ থেকে গোপন রেখেছেন, যাতে সর্বদা তার মনে মৃত্যুর আশঙ্কা লেগে থাকে, আর কুপথে অগ্রসর হলে যাতে খোদার ভয় অন্তরে জাগরিত হয়। আর মৃত্যুর পূর্বে সৎকাজ করার ধারণা সৃষ্টি হয়।

মানুষ যে সব জিনিস ভোগ উপভোগ করে সেগুলির প্রতি লক্ষ্য করে দেখ! আল্লাহ্ সে সবের ভিতরে কি কি কল্যাণ আর রহস্য নিহিত রেখেছেন, আল্লাহ্ খাদ্যদ্রব্যে কত লজ্জৎ আর স্বাদ নিহিত রেখেছেন। নানা প্রকার খাদ্য আর ভিন্ন স্বাদ রকমারি ফল-ফলাদি আর খুশবুর প্রতি লক্ষ্য কর। দেখ ফুলগুলির কি মনোমুগ্ধকর ঘ্রাণ আর অনেকগুলি দ্বারা তেল আতর প্রভৃতি তৈরী হয়। মানুষ সেগুলি শরীরে ও বস্ত্রে ব্যবহার করে সভা সমিতিতে যায়। তোমাদের বাহনগুলির প্রতি লক্ষ্য কর (এখানে পশুর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে) দেখ! তা কত প্রকার, আর তার আরাম-উপকারিতা। হালাল পশুগুলি দেখ, উহার গোশ্ত কত সুস্বাদু, আবার তার কতগুলি দ্বারা আমাদের কৃষি কাজে সাহায্য হয়। পানি সেচের কাজে সেগুলি আমাদের কত সাহায্য করে। (সে যুগে যান্ত্রিক সেব ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয় নাই।) পাখী জাতির প্রতি লক্ষ্য কর, সেগুলি কত শত রকমের। তাদের কুজন, সুরেলা গান শুনে মানুষের মন-প্রাণ মুগ্ধ হয়।

উদ্ভিদ, তৃণ-লতাগুলির প্রতি লক্ষ্য করে দেখ। এগুলির ভিতরে আল্লাহ্ রোগ-ব্যাধি নিরাময়ের গুণ নিহিত রেখেছেন। রকমারি পোশাক-পরিচ্ছদ আর ঋতু ভেদে সেগুলির বিভিন্নতা লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞানবুদ্ধি দান

করেছেন। তাই তারা প্রকৃতির এসব জিনিস থেকে প্রয়োজন মেটাবার ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। মুদ্রাগুলির কথা চিন্তা কর, এগুলি দ্বারা মানুষ তার জীবনের অজস্র প্রয়োজন মিটায়। আল্লাহ্ কি হেকমত ওয়ালা আর কৌশলী, প্রকৃতির ভাণ্ডারে তিনি কত রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা ভেবে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। লোকের চাহিদা আর প্রয়োজন অনুসার বিভিন্ন লোক প্রকৃতির বিভিন্ন জিনিস থেকে উপকার লাভ করে। এই বিভিন্নতার কারণে কেউ ধনী আর কেউ দরিদ্র। ধনী আর গরীবের মধ্যে পার্থক্যও এ কারণেই হয়। আর এরই কারণে বিস্তার লাভ করে সভ্যতা।

এই প্রকৃতির ভাণ্ডারে বে-শুমার জিনিস আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। সেগুলির পুরো রহস্য উদ্‌ঘাটন করা আর বর্ণনা করা লোকের সাধ্যাতীত। সৃষ্টির রহস্য আর হিকমত একমাত্র সেই মহাজ্ঞানী আর কুশলী স্রষ্টাই জানেন, যার দয়া সর্বব্যাপী, যার জ্ঞান অসীম।

এই অধ্যায়ের পরিশিষ্ট

আল্লাহ্ মানব জাতিকে দিয়েছেন সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান আর মর্যাদা। অন্য কোন প্রাণীকে তা দেন নি।

আল্লাহ্ পাক কুরআনে বলেনঃ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًا ۔

অর্থঃ আর আমি আদম সন্তানকে দিয়েছি সম্মান আর স্থলে ও জলে চলার যানবাহন দিয়েছি আর দিয়েছি পবিত্র খাদ্য। আর সৃষ্টির বহু জিনিসের উপর তাদের বৈশিষ্ট্য দান করেছি।

(সূরা বনি ইসরাঈল আয়াত নং-৭০)

মানুষের এই সম্মান, বৈশিষ্ট্য আর মর্যাদার মূলে রয়েছে তার জ্ঞান। এই জ্ঞানের ফলেই সে আল্লাহ্‌র নৈকট্যের অধিকারী, এই জ্ঞানের সাহায্যে সে সৃষ্টির বিষয়ে চিন্তা গবেষণা করে স্রষ্টাকে চিনতে পারে; সে নিজের অস্তিত্বের বিষয় চিন্তা করে আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করে।

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَفِىٓ اَنْفُسِكُمْ ۚ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ ۔

তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে আল্লাহ্‌র কুদরতের নিদর্শন। তুমি কি তা দেখ না?

মানুষ যখন চিন্তা করে নিজ সৃষ্টির প্রতি, নিজ জন্মের কথা ভাবে আর দেহরাজ্যের শৃঙ্খলার কথা চিন্তা করে, আর খোদা প্রদত্ত হিকমত আর শক্তির কথা ভাবে, তখন আল্লাহ্‌র মহিমা আর কুদরতের বিষয়ে আস্থাবান হয় আর তিনি যে মহান স্রষ্টা, এ বিষয়ে মাথা নত করে মেনে নেয়। এই জ্ঞানের দ্বারা মানুষ ভাল-মন্দ, খুঁতনিখুঁত, উপকার ও অপকারের ভিতর পার্থক্য করতে পারে। অজ্ঞান, মুর্খ ব্যক্তি দেহের গঠন নৈপুণ্য দেখতে পায় না, না জ্ঞানের অস্তিত্ব অনুভব করে, না তার সামান্য ঘ্রাণ পর্যন্ত লাভ করে। এ সত্ত্বেও সে জ্ঞানকে অস্বীকার করতে পারে না এবং তার কল্যাণ ও অবদান অস্বীকার করতে পারে না। এই জ্ঞানের সাহায্যে মানুষ অসংখ্য অদৃশ্য জিনিস দেখতে পায়, যেখানে পৌঁছে না চোখের দৃষ্টিশক্তি, পৌঁছে না শ্রবণ শক্তি, এসব শক্তি যেখানে অপারগ সেখানে জ্ঞানই তার কাজ করে। আসমান জমিনে বহু কিছু লোকচক্ষুর অগোচরে, কিন্তু জ্ঞানের চক্ষুর নিকট তা সুস্পষ্ট। কুদরতের যে সব জিনিস বাহ্য ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তা জ্ঞান ও অনুভূতির নিকট ব্যক্ত ও দৃশ্যমান। যতই জ্ঞান পরিচালনা করবে ততই তার চক্ষের জ্যোতি আর নূর বৃদ্ধি পাবে, ফলে দেখতে পাবে মহাকাশের অদৃশ্য দৃশ্যাবলী আর ভূ-গর্ভে প্রচ্ছন্ন খনিজ সম্পদ। জ্ঞান চক্ষুর সামনে এগুলি প্রতিভাত হয়ে উঠে।

মানুষ নিজ দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি যখন লক্ষ্য করে, আর তার ইচ্ছার সাথে সাথেই অংগ সঞ্চালিত হয়, আর সে সঞ্চালন এত দ্রুত হয় যে এটা তার বিচার করা কঠিন হয়ে পড়বে, কোনটি আগে-ইচ্ছা না সঞ্চালন। অবশ্য ইচ্ছাই প্রথম, তবে আল্লাহ্ দেহের অংগ প্রত্যংগকে ইচ্ছার এতই অনুগত করে দিয়েছেন

যে ইচ্ছার সাথে সাথেই অংগ প্রত্যংগ তার আনুগত্যের জন্য সক্রিয় হয়ে উঠে। এই জ্ঞান এবং অনুভূতি সত্ত্বেও মানুষ তার নিজ সৃষ্টি দর্শন পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে অক্ষম। কেননা,কখনো সে কোন কোন বিষয়ে পূর্ণ অজ্ঞতা প্রকাশ করে। এ সত্ত্বেও অনেক সূক্ষ্ম ও জটিল বিষয়ে সমাধান করে ফেলে আবার কখনো সে কোন ব্যাপারে মহাজ্ঞানী বলে দাবী করে কিন্তু সে এমন কিছু করে বসে, যার কারণে পরিণামে সে শরমিন্দা হয়।

সে অনেক কিছু ভুলে যায় এবং ইচ্ছা করেও স্মরণ রাখতে পারে না। আবার অনেক কিছু ভুলতে চেষ্টা করেও ভুলতে পারে না। মানুষ মনে মনে চায় সুখে স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাতে আর দুঃখ–কষ্ট যেন কাছে ঘেষতে না পারে; কিন্তু স্পষ্ট সে এমন অবস্থার শিকার হয় যে, তার জীবনের আরাম–আয়েশ সব দুঃখে–কষ্টে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। কখনো কোন ব্যাপারে সে নিজকে খুব সাবধান আর সতর্ক রাখতে চেষ্টা করে, কিন্তু এক সময় সে সতর্ক অসাবধান হয়ে পড়ে। কখনো সে নিজকে মহাবিজ্ঞ বলে ধারণা করে কিন্তু কাজের বেলায় তার অজ্ঞতা আর মূর্খতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। কখনো সে হয়তো নিজকে অজ্ঞান মূর্খ বিবেচনা করে, কিন্তু অনেক বড় বড় কৌশল আর বুদ্ধিমত্তা তার কাজে প্রকাশ পায়। তাতে অসাধারণ জ্ঞান ও কুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়। এ সত্ত্বেও সে নিজ রহস্য সম্পর্কে অজ্ঞই থেকে যায়। স্বর কিভাবে সৃষ্টি হয়, কোন পর্যন্ত পৌঁছে কথার বর্ণগুলি কিভাবে সৃষ্টি হয় এবং তা অর্থপূর্ণ হয় তার দৃষ্টিশক্তি কতদূর পৌঁছে, চোখ ছাড়া চোখর কাজ কিভাবে সম্পন্ন হয়, চোখের মধ্যে জ্যোতি কিভাবে কোথা থেকে আসে কিভাবে সম্পন্ন হয়, চোখে দৃশ্য প্রতিফলিত হয়, কিভাবে সে দেখতে পায় তার মনে কিভাবে ইচ্ছার উদ্রেক হয়, জন্মের পূর্বে সে কোথায় ছিল, এসব বিষয়ের চিন্তা–ভাবনা তাকে সেই অসীম কুদরতের মালিক অপার মহিমার অধিকারীর হিকমত ও নৈপুণ্যের প্রতি বিশ্বাসী করে তুলে।

আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে কামনা দান করেছেন, যা তার প্রকৃতির অনুকূল। যদি সে তার কামনা–বাসনা পূর্ণ ও চরিতার্থ করার ব্যাপারে জ্ঞান দ্বারা পরিচালিত হয় তবে সে বিপর্যয় আর ধ্বংস থেকে নিজকে বাঁচাতে পারে; আর মর্যাদার উচ্চ সীমায় আরোহণ করতে পারে আর যদি সে তার বাসনাগুলিকে প্রবৃত্তির পথে পরিচালিত করে, তবে সে মারেফাতের আলো থেকে বঞ্চিত থাকবে। আর আখেরাতে যে কাজের জন্য বিরাট পুরস্কারের অংগীকার রয়েছে সে সব কাজও

সে করতে পারে না। পাপপূণ্য নির্ভরশীল রয়েছে সেই বাসনাগুলির সঠিক ব্যবহারের উপর। আসলে মানুষের মধ্যে যে কামনা আর বাসনা দান করা হয়েছে, মানুষের জীবনে সেগুলি হচ্ছে হাতিয়ার। মানুষের মস্তিষ্কে আল্লাহ্ যে শক্তি সঞ্চিত রেখেছেন, অর্থাৎ চিন্তা, পরিকল্পনা প্রভৃতি তাও এই বাসনা ব্যতীত বেকার হয়ে পড়ে। মূলে বাসনা আর এই শক্তির পাস্পরিক সমন্বয়, যার একটি ব্যতীত অপরটি বেকার। মানুষ তখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে যখন সকল শক্তি পারস্পরিক সমন্বয়ের সাথে কাজ করে। কাজের ভাল মন্দ আর চরিত্রের উৎকর্ষতা আর অপকার্যত আর কালের সাথে সমঞ্জস হওয়া সকলই এর উপর নির্ভরশীল।

সুতরাং লক্ষ্য কর, আল্লাহ্ মানুষের মধ্যে কি কি গুণাবলী সৃষ্টি করেছেন। পাত্রের মূল্য নির্ণীত হয় পাত্রের মধ্যস্থ জিনিস দ্বারা। ঘরের মর্যাদা গৃহে অবস্থানকারীর দ্বারা হয়ে থাকে। আল্লাহ্ মানুষের কলবকে তার মারেফতের গৃহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। এতে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আল্লাহ্ মানুষের প্রত্যাবর্তন আর গন্তব্য স্থান হিসাবে অন্য একটি গৃহ নির্দিষ্ট রেখেছেন; যাকে আখেরাত বলা হয়। সে গৃহের অবস্থা আর পরিচয় মানুষের কাছ থেকে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন। সে গৃহের খবরের জন্য আল্লাহ্ রিসালত সৃষ্টি করেছেন। সে নূরের আলোকে মানুষের প্রতি আখেরাতের অবস্থা প্রকাশ পায়। এ কারণে আল্লাহ্ দুনিয়াতে নবী আর রাসূল প্রেরণ করেছেন। তাঁদের দুটি কাজ। আল্লাহ্র অনুগত বান্দাদের জন্য তারা সুসংবাদ দানকারী (বাশীর) আর তার নাফরমান বান্দার জন্য ভীতি প্রদর্শনকারী (নাযীর)। ওহীর দ্বারা আল্লাহ্ নবীগণের সাহায্য করেছেন। ওহী ধারণ আর সংরক্ষণের ক্ষমতা আল্লাহ্ নবীগণকে দান করেছেন।।

নবীগণ পার্থিব ব্যাপারের জ্ঞান ও হিকমত শিক্ষা দিয়েছেন। আর আখেরাতের বিষয়ও যা কল্যাণকর আর জ্ঞান গবেষণা রয়েছে তাও তাঁরা অবহিত করেছেন। এই খোদাতত্ত্ব দর্শন যা নবী আর রাসূলগণের সাহায্যে অর্জিত হয়েছে তা জ্ঞানের আলোক দ্বারা কখনো অর্জিত হওয়া সম্ভব হতো না। পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্ এমন সব সুস্পষ্ট প্রমাণ আর প্রকাশ্য নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছেন যার প্রতি মানুষের ঈমান আনা অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এভাবে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি তার দান পূর্ণ করে দিয়েছেন আর প্রমাণও চূড়ান্ত হয়েছে। দ্বীন–দুনিয়ার উভয় রাস্তাই

তাঁরা দেখিয়ে দিয়েছেন। মুক্তি আর সর্বনাশের উভয় রাস্তাই সুস্পষ্টভাবে মানুষের কাছে তুলে ধরা হয়েছে।

দেখ! আল্লাহ্ মানুষকে কি সম্মান মর্যাদা দান করেছেন, তার বংশাবলীকে করেছেন সম্মানিত। তাদের বংশধারা থেকে মহান, কত সম্মানিত ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছেন। তাদের কেউ লাভ করেছেন নবুয়ত আর বেলায়েতের মর্যাদা আর কেউ আল্লাহ্র নূরের প্রতিবিম্ব লাভ করেছেন। সুতরাং যে ভাগ্যবান সে ঈমান এনে আল্লাহ্র নেয়ামতের প্রকাশক আর দান ও অবদানের অধিকারী হয়েছে, আর দুর্ভাগা সে নবুয়তে ও বেলায়েত অস্বীকার করে চিরদুঃখ আর দুর্ভাগা সে নবুয়তের ও বেলায়েত অস্বীকার করে চির দুঃখ আর দুর্ভাগ্য খরিদ করেছে। সে শুধু পার্থিব জীবনের জন্য আখেরাত বরবাদ করে দেয়।

আল্লাহ্র এই ইহ্সান আর নেয়ামতের দ্বার রুদ্ধ হয় নাই। বরং কখনো নিদ্রায়, কখনো স্বপ্নযোগে, কখনো বা সূক্ষ্ম জগতে এমন এমন নিদর্শন দেখানো হয়, যদ্দ্বারা হেদায়েত আর খোদার ইচ্ছা জ্ঞাত হওয়া যায়। কখনো বা স্বপ্নযোগে কোন কাজ থেকে মানুষকে বিরত করা হয়, ঐ উদ্দেশ্যে ভীতি প্রদর্শন করা হয়, কখনো বা কোন কাজে উৎসাহিত করা হয়। এমন কাজে যার খবর একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর কেউ জানে না। তা তিনি কোন না কোন ভাবে তার বিশেষ বান্দাকে অবগত করিয়ে থাকেন। এসবই আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কারণে হয়ে থাকে।

পাখী সৃষ্টির কথা

আল্লাহ্ বলেনঃ

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِىْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ -

তুমি কি দেখ না যে, পাখীকুল আকাশে বিচরণ করে। এক আল্লাহ্ ছাড়া কেউ তাদেরকে আকাশে ঠেকিয়ে রাখতে পারে না।' (সূরা নাহল)

আল্লাহ্ পাখীগুলি সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলি এমন আকারে আর গঠনে পয়দা করেছেন, যা তার উড়বার পক্ষে সহায়ক হয়। তার ভিতরে কোন ভারী জিনিস পয়দা করেন নি যা তার উড়বার পক্ষে বাধা আর বিঘ্ন হয়। পাখীর জন্য যাহা দরকার তা আল্লাহ্ তাকে দান করেছেন। সেভাবেই তার দেহের কাঠামো তৈরী করেছেন। তার জন্য খাদ্য সৃষ্টি করেছেন, খাদ্য থেকে প্রত্যেকটি অংগের জন্য উপযোগী অংশ পৌছে থাকে। অংগের নরম, শুষ্ক আর শক্ত অংগের জন্য উপযোগী খাদ্য–সার সরবরাহ হয়ে থাকে, যাতে সে সব অংগে শক্তি সঞ্চারিত হয়।

পাখীকে আল্লাহ্ দিয়েছে দু'খানি পা। হাত দেওয়া হয় নি। পা দিয়ে সে মাটিতে চলাফেরা করতে পারে, গাছের ডালে বসতে পারে। উড়ার সময়ও পায়ের সাহায্য নেয়। পায়ের নীচের দিকে খানিক চওড়া, যাতে সে মাটির উপর ভালভাবে দাঁড়াতে পারে। অঙ্গুলীগুলির কতকাংশ খুব পাতলা চামড়া দ্বারা আবৃত যা নলার চামড়া থেকে একটু শক্ত। নলায় বেশ পুরু আর শক্ত। যাতে শীত গ্রীষ্মের প্রকোপ থেকে বাঁচতে পারে। পা পালক শূন্য হওয়ার মধ্যেও রয়েছে বিশেষ রহস্য। কেননা পাখীকে তার খাদ্য কুড়ানোর আর পানি পানের জন্য এমন সব জায়গায় বিচরণ করতে হয়, যেখানে পানি, কাঁদা বা ময়লা আবর্জনা থাকতে পারে। যদি পায়ের নলায় পালক থাকতো তবে পানি বা কাঁদায় ভিজে ভারী হয়ে পড়তো আর তার চলাফেরায় হতো ভারী অসুবিধা। এ কারণেই আল্লাহ্ পাখীর দেহে যেখানে পালকের প্রয়োজন নেই, সেখানে পালক দেননি,

যাতে সে স্বাচ্ছন্দ্যে চলতে ফিরতে এবং উড়তে বাধা না পায়। পাখীগুলির পা খুব লম্বা লম্বা করে পয়দা করা হয়নি। বরং গলা অপেক্ষাকৃত লম্বা তৈরী করা হয়েছে, যাতে তার খাদ্য আহরণ আর দানা কুড়ানো সহজ হয়। যদি পা লম্বা লম্বা আর ঘাড় খুব ছোট হতো তবে বনে জঙ্গলে দানা কুড়ানো আর নদী-নালা থেকে পানি পান করা তার পক্ষে কষ্টকর হতো। সেরূপ হলে তার দানা কুড়ানো আর পানি পানের জন্য তাকে বুক নীচু করতে হতো। কোন কোন পাখীর ঠোঁট বেশ লম্বা। এটা তার খুব কাজে আসে। যদি গলাটা তার খুব লম্বা আর পা খুব ছোট হতো তবে ঘাড়টা তার কাছে খুব ভারী হয়ে পড়তো, ফলে তার খাদ্য আহরণ অনেকটা কষ্টকর হতো। পাখীর বুক আল্লাহ্ গোলাকৃত করে এমনভাবে বিন্যস্ত করেছেন, যাতে উড়ার সময় সে সহজে বায়ু কেটে এগিয়ে যেতে পারে। অনুরূপভাবে তার পাখাও এমনভাবে তৈরী করা হয়েছে, যাতে তার পক্ষে উড়া সহজ হয়। তারপর পাখীগুলির শ্রেণীভেদে আর তাদের আহার গ্রহণের সুবিধার দিক লক্ষ্য রেখে তাদের কোনটির ঠোঁট লম্বা, ক্ষুদ্র, ধারালো, দৃঢ়, বক্র বা সোজা করে তৈরী করা হয়েছে, যাতে সে খুব শক্ত জিনিসটিও ছিঁড়তে এবং কাটতে পারে। কোন কোন পাখীর চঞ্চু এতো ধারালো আর মজবুত যে, অতি কঠিন দ্রব্যও ঠুকরিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে পারে আর হাড় থেকে গোশ্ত ছিড়ে আনতে পারে। কোন কোন পাখীর ঠোঁট চওড়া যাতে তার উপর খাদ্য-দানা প্রভৃতি রাখা যেতে পারে। আবার কতকগুলির ঠোঁট সোজা যাতে সে শাক-সব্জি, তরি-তরকারী খেতে পারে। কতকগুলি পাখীর ঘাড় বেশ লম্বা আর হাড়ের ন্যায় শক্ত কিন্তু ভিতরের দিকে নরম। তার দ্বারা হাড়ের কাজ হয়ে থাকে। পাখীর পালকগুলিকে খোদা লম্বা আর বাঁশের ন্যায় ফাঁপা করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে তার উড়া সহজ হয়। পাখীগুলির দণ্ড ডানার সাথে দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হয়েছে, যাতে দিনরাত উড়লেও তা খারাপ না হয়। কেননা উড়ার সময় পাখার পালকগুলি খুব দ্রুত সঞ্চালন করতে হয়। এ কারণে পালকগুলি খুব মজবুত করে তৈরী করা হয়েছে। আবার সেগুলি শীত গ্রীষ্মে শরীর আচ্ছাদনেরও কাজ করে। পাখার সর্বাংগে পালকগুলি একদিকে যেমন তাকে শীত-গ্রীষ্ম থেকে বাঁচায়, অন্য দিকে তার সৌন্দর্যও বাড়ায়। আবার পালকগুলি এমন উপায়ে সৃষ্টি যে, ক্রমাগত ভিজলেও তা নষ্ট হয় না। বরং সামান্য ঝাপটা দিলেই পানি ছিটকে পড়ে যায়।

পাখীর পুচ্ছ এমনভাবে তৈরী, যাতে তার উড়ায় সাহায্য করে এবং বাতাসের বেগ তাকে একদিকে ঠেলে নিয়ে না যায়। যদি পুচ্ছ না হতো সে ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট দিক উড়ে যেতে পারতো না। সুতরাং পুচ্ছ একাধারে নৌকার হালের মতো হাল আর পালের কাজ করে।

পাখীরা ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় বাস করায় অভ্যস্ত। এতে তাদের নিরাপত্তা রয়েছে।

পাখীরা চর্বণ ছাড়াই খাদ্য গিলে ফেলে। এ কারণে অনেক পাখীর ঠোঁট এত ধারালো যে, গোশ্ত প্রভৃতি জাতীয় খাদ্য ঠোঁটের সাহায্যে কেটে টুকরো করে ফেলে, যাতে তা সহজে হজম হয়। পাখীর পাকস্থলীতে এমন হজমশক্তি সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে অতি কঠিন খাদ্যগুলি সহজে গলিয়ে হজম করে ফেলে। সুতরাং তার চর্বণ এবং দাঁতের প্রয়োজন হয় না। এর প্রমাণ এভাবে পাওয়া যেতে পারে যে, যদি পাখী ছাড়া অন্য কোন প্রাণীকে একটা আস্ত আংগুর খাইয় দেওয়া হয় তবে তা পায়খানার সাথে তেমনি আস্ত নির্গত হয়ে আসবে। আর যদি পাখীকে খাইয়ে দেওয়া হয় তবে তা পরিপাক হয়ে যাবে কেননা পাখীর পেটে যে হজম শক্তি আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, অন্য কোনো প্রাণীর তা নেই।

পাখীরা ডিম দেয়। তারপর সে তা দিয়ে ডিম ফুটায়। পাখীকে এ শিক্ষা কে দিয়েছে যে নিজের মুখে দানা রেখে নরম হলে তার পর বাচ্চাকে আহার করায়। বাচ্চা যতদিন খাদ্য গ্রহণের উপযুক্ত না হয়, ততদিন শুধু বায়ু সেবন করিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। দেখ! বনের পাখী তার বাচ্চাগুলির প্রতিপালনে কত কষ্ট ভোগ করে থাকে। অথচ মানুষের ন্যায় পাখীর জ্ঞান বুদ্ধি নাই, না আছে তার দুরদর্শিতা আর বুদ্ধি বিবেচনা। আর পাখীরা নিজ বাচ্চাদের দ্বারা মানুষের ন্যায় বংশ বৃদ্ধিরও আশা রাখে না। পাখীকুল এসব জ্ঞান-বুদ্ধি আর ভবিষ্যৎ ভরসা আর চিন্তাভাবনা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। এ সত্ত্বেও তার সন্তান প্রতিপালনে অশেষ যত্ন নিয়ে থাকে, নিঃসন্দেহে পাখীর অন্তরে খোদার দেওয়া প্রেরণাই এর কারণ।

আবার দেখ স্ত্রী পাখীর ডিম প্রসবের সময় হলে কি ভাবে টের পায়। ডিম পাড়ার এবং রক্ষা করার জন্যে সে কিভাবে খড়-কুটো সংগ্রহ করে বাসা তৈরী করে, যাতে সে ডিম প্রসব করে, তারপর বাচ্চা বের না হওয়া পর্যন্ত ডিমে তা দিতে থাকে। কবুতরের অবস্থা দেখ! যে বাইর থেকে ডিমের ভিতরের অবস্থা বুঝতে পারে এবং বাচ্চা পূর্ণ হলে তাকে ঠুকরিয়ে ডিমের ভিতর থেকে বের

করে, যদি ডিম কোনভাবে নষ্ট হয়ে যায়, কবুতর তা বুঝতে পারে, সে ডিমে তা দেয়া ছেড়ে দেয়, এমনকি ডিমটি বাসা থেকে ঠুকরিয়ে বাইরে ফেলে দেয়।

বাচ্চা ডিম থেকে বের হয়ে আসার পর কবুতর তার বাচ্চাকে প্রথমে বাতাস সেবন করায়। তারপরে নরম খাদ্য এবং ক্রমান্বয়ে যখন সে অনুভব করে যে, তার পাকস্থলী খাদ্য পরিপাক করার শক্তি অর্জন করেছে, তখন সে তাকে দানা-পানি খেতে দেয়। যদি প্রথম থেকেই তাকে দানা খেতে দিত, তবে বাচ্চা তা হজম করতে অপারগ হতো। কবুতরের মধ্যে এই জ্ঞান বুদ্ধি কে দান করেছেন, যার ফলে সে বাচ্চার হজমশক্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে সক্ষম হয়েছে। মহাজ্ঞানী আর কৌশলী আল্লাহ্ই তাকে এই জ্ঞান দান করেছেন। ডিম থেকে বাচ্চা বেরিয়ে আসার পর কবুতর তাকে নিজ পাখার নীচে আগলিয়ে রাখে, যাতে সে গরম থাকে। কেননা ডিমের গরম থেকে সদ্য বের হয়ে হঠাৎ ঠাণ্ডা লেগে মরে না যায়। এ কারণে বাচ্চাগুলি পাখার নীচে ঢেকে গরম রাখে।

সব পাখীই বাচ্চা দেবার বেলায় এক রকম নয়। তারা নানা শ্রেণীর! প্রত্যেক জাতের পাখীর বাচ্চা দেবার হেকমত আর কৌশল ভিন্ন রয়েছে—যেমন আল্লাহ্ ব্যবস্থা করেছেন। মুরগী দেখ! তার মধ্যে বাচ্চাগুলিকে আহার করাবার স্বভাব আল্লাহ্ দেন নি। এ কারণে মুরগীর বাচ্চা ডিম থেকে বের হয়ে এলেই নিজের খাদ্য সংগ্রহ করে খায়। দানা, খুদ ঠুকরিয়ে খেতে শুরু করে দেয়।

তারপর স্ত্রী ও পুরুষ জাতীয় পাখীর প্রতি লক্ষ্য করে দেখ। কিভাবে তারা নিজ বাচ্চা রক্ষায় সচেষ্ট হয়ে থাকে। তারা পরস্পরে বাচ্চাগুলিকে পাখার নীচে রেখে তাপ দেয়, যাতে ঠাণ্ডা লেগে মরে না যায়। আর ডিমও যাতে নষ্ট না হয়, ডিম আর বাচ্চাগুলিকে তাপ দেবার বেলায় তারা খুবই সচেতন। তারা ভাল করেই জানে যে, যদি পুরোপুরি তাপ দেওয়া না হয় তবে ডিম নষ্ট হয়ে যাবে। আর বাচ্চা মরে যাবে। ডিমের গঠন লক্ষ্য কর। তার উপাদানগুলি দেখ। তা' দুই প্রকার আর দুই রং-এর। এক হলো সাদা লাল-যা বাচ্চার খাদ্যের জন্য, আর দ্বিতীয় হলদে কুসুম যা বাচ্চার অবয়ব গঠনের জন্য রাখা হয়েছে। দেখ আল্লাহ্ বাচ্চার জন্মের পূর্বেই ডিমের মধ্যে তার খাদ্য সংরক্ষিত করেছেন।

দেখ, পাখীর থলের মধ্যে খাদ্য যাওয়ার রাস্তা কিভাবে সহজ করা হয়েছে। কেননা, একটি দানা থলিয়ায় পৌছা পর্যন্ত যদি দ্বিতীয় দানার জন্য অপেক্ষা করতে হয় তাতে আহার করতে ঢের সময়ের প্রয়োজন হবে। পাখীদের সর্বদা

শিকারীর ভয়। সামান্য শব্দ হলেই চমকে উঠে আর উড়ে পালায়। সুতরাং একটি একটি করে দানা গিলে খাবার মতো অবকাশ তার কোথায়? এ কারণে আল্লাহ্ তার থলেকে খাদ্য জমা রাখার ন্যায় একটি পাত্র করেছেন। পাখী সেখানে তাড়াতাড়ি টপাটপ খাদ্য জমা করে নেয়। পরে এক দানা পাকস্থলীতে নিয়ে হজম করে। অবশ্য সব পাখীর বেলায় একই অবস্থা নয়। বরং যে পাখী নিজ থলে থেকে খাদ্য বের করে নিজ বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায় তাদের জন্য তলে থেকে দানা বের করা সহজ করা হয়েছে।

পাখীর পালকগুলির গঠন লক্ষ্য কর। পালকগুলি কাপড়ের সুতার ন্যায় সূক্ষ্ম তার দ্বারা পরস্পর জড়িত। কিছুটা শুষ্ক আর বেশ শক্তও। আবার এমন নরম যাতে চাপে ভেঙ্গে না যায়। পালকগুলি ভিতর থেকে খোক্‌লা আর খুব হালকা। আবার পালকগুলি পরস্পর জড়িত। যাতে ডানা বিস্তার করলে তার ভিতরে বায়ু প্রবেশ করে উড়া সম্ভব করে তুলে। পালকের মাঝে একটি মোটা শুষ্ক আর শক্ত দণ্ডের ন্যায় রয়েছে, যার কিনার দিয়ে পালকগুলি গজায়। এই দণ্ড পালকগুলিকে নিয়ন্ত্রিত আর সংরক্ষিত করে। এই দণ্ডটি ভিতর থেকে ফাঁপা যাতে হালকা হয়, তবে তাও বেশ শক্ত। পালকগুলির মধ্যে যদি এই দণ্ডটি না থাকতো তবে সেগুলিকে বায়ুর মুকাবিলায় টিকে থাকতে পারতো না। বরং বাতাসে পাখীর উড়াই অসম্ভব হতো।

লম্বা পা বিশিষ্ট পাখিগুলির প্রতি নজর কর। সাধারণত এগুলি খোলা জায়গায় অথবা জলাশয়ের ধারে আহার সন্ধান করে। মনে হয় যেন সে পানির নীচে তার লক্ষ্যবস্তুটি খোঁজ করে বেড়ায়। সন্ধান পাওয়া মাত্র দু' এক পা এগিয়ে গিয়ে সেটি শিকার করে। যদি তার পা ছোট হতো তবে বুক আর শরীরে পানিতে ডুবিয়ে ঢেউ তুলতো। ফলে সাড়া পেয়ে তার শিকারটি পালিয়ে যেত। সুতরাং তার পা লম্বা হওয়া তার জন্য খুবই বাঞ্ছনীয় আর যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

ছোট চড়ুই পাখী দেখ। খুব ভোরে সে তার বাসা থেকে খাদ্যের খোঁজে বের হয়। আর এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে নিজের আহার খোঁজ করে বেড়ায়। সন্ধ্যা বেলা পেট ভরে নিজ বাসায় ফিরে আসে। এদের জন্য এটাই খোদার বিধান। এদের খাদ্য এক স্থানে জমাকৃত অবস্থায় পাওয়া যায় না। যদি তাদের খাদ্যের খোঁজে দূরে দূরে যেতে না হতো আর এক স্থানে তাদের খাদ্য সঞ্চিত থাকত তবে লোভের বশে এত বেশী খেত যে, তার পক্ষে উড়াই সম্ভব হতো না আর

হজম করাও অসম্ভব হতো। কোন কোন প্রাণী অধিক আহার করার পর বমি করে পেট হালকা করে। এ কারণে ছোট পাখীগুলি নিজ আহারের খোঁজে এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে অল্প আহার করার মধ্যে বিরাট রহস্য নিহিত রয়েছে। এভাবে তাদের খাদ্যও হজম হয়ে যায় আর উড়তেও কষ্ট হয় না।

মানুষের বেলায়ও এই রীতি। যদি বিনা পরিশ্রমে এক স্থানে বসে বসে খাদ্য লাভ করতো, তবে সে অচিরেই রুগ্ন হয়ে পড়তো।

এবার সেই পাখীগুলির প্রতি লক্ষ্য কর, যেগুলি রাত্রিতে বের হয় দিনের বেলায়। মোটেই উড়ে না। যেমন পেচক, আবাবীল, চামচিকা, বাদুড় প্রভৃতি। তারা মশা, পতঙ্গ প্রভৃতি খেয়ে জীবন ধারণ করে। তারা জমিনের কাছাকাছি থেকে খাদ্য আহরণ করে। এতে রয়েছে খোদার অশেষ হিকমত। হয়তো তাদের চোখের দৃষ্টিশক্তি জমিন থেকে আহার খুঁজে নেওয়ার উপযোগী নয়। নিঃসন্দেহে এ পাখীগুলির দিনের বেলায় দৃষ্টিশক্তির অভাব। এ কারণে সূর্যের আলোতে এ সব পাখী বের হয় না। যেখানে সূর্যের আলো থাকে না অথবা সূর্য অস্ত যাওয়ার পর তারা বাইরে বের হয়। সুতরাং আল্লাহ্ তাদের আহার সংগ্রহের বিধি এভাবেই করেছেন।

চামচিকাকে আল্লাহ্ পালকহীন সৃষ্টি করেছেন। সেই হিসাবে তার অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগও সৃষ্টি করা হয়েছে। তার মুখে দাঁত আছে। জমিনে বসবাসকারী অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় তার সব কিছুই আছে। সে বাচ্চা দান করে। এসব সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাকে উড়বার শক্তি দিয়েছেন, যাতে প্রমাণ হয় যে, আল্লাহ্ প্রাণীর পালক ও পশম ব্যতীতও উড়াতে সক্ষম। আর পালক জাতীয় প্রাণী ছাড়া অন্য জাতীয় প্রাণীকে উড়বার শক্তি দান করতে পারেন। এভাবে এক জাতীয় প্রাণী মৎস্যও আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন, যেগুলি বেশ কিছুদূর উড়ে যেতে সক্ষম। তারপর আবার পানির মধ্যে চলে যায়।

কপোত আর কপোতীর পারস্পরিক সহযোগিতার প্রতি লক্ষ্য কর। তারা কিভাবে ডিমে তা দেবার বেলায় একে অন্যের সাহায্য করে। যখন একটি খাদ্যের তালাশে চলে যায় তখন অন্যটি তার স্থানে ডিম তা দিয়ে বসে থাকে। এভাবে একটির অনুপস্থিতিতে ডিমে তা' দেবার ক্ষেত্রে ছেদ পড়ে না। আবার একটি দূরে গেলেও অধিক সময় দূরে থাকে না। প্রত্যেকেরই ডিমের চিন্তা

থাকে। এমনকি মল ত্যাগের বেগ হলেও তা চেপে রাখে। পরে হঠাৎ এক সময় তারা মল ত্যাগ করে। তাও যখন আর বেগ ধারণ করা না যায়। কবুতর গিন্নী যখন ডিমবতী হয়, তখন পুরুষ কবুতর তার ভারী যত্ন নিয়ে থাকে। এমনি তাকে বাসা থেকে বের হতে দেয় না। এই আশংকায় যে অন্য কোথায় ডিম দেয়। আর ডিম নষ্ট হয়ে না যায়। ডিম থেকে বাচ্চা বের হবার পর কবুতর আর কবুতর গিন্নী উভয়ই বাচ্চাকে আহার করায়, তারা বাচ্চার প্রতি খুবই মমতা প্রদর্শন করে। যখন বাচ্চা বড়ো হয় আর অভ্যাস অনুযায়ী বাপ-মায়ের কাছে দানা পানি চায়, তখন তারা তাকে ঠুকরিয়ে নিজেদের থেকে পৃথক করে দেয়, যাতে সে নিজের আহার নিজেই যোগাড় করে নেয়।

আল্লাহ্ এদেরকে উড়বার কতো শক্তি দিয়েছেন। কেউ এদের ধরতে গেলে হাতে আসে না, হুট করে উড়ে পালায়। পাখীর পাঞ্জায় শক্তি, চঞ্চুতে ধার, আর অংগুলির মাথায় নখ রয়েছে। নখ দ্বারা ছুরির কাজ হয়। কখনও পাঞ্জায় গোশ্ত লট্‌কিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যায়। পানির পাখীগুলি পানিতেই জন্মলাভ করে। তাদের উড়ার শক্তি ছাড়াও পানিতে সাঁতার কাটার আর ডুব দেওয়ার শক্তি রয়েছে, যাতে সে গভীর পানিতে নিজের আহার সন্ধান করতে পারে।

মোটকথা, আল্লাহ্ সকল জাতীয় পাখীকে তাদের প্রয়োজন মতো সবকিছু দিয়েছেন, যদ্দ্বারা তারা জীবনের সব প্রয়োজন মেটাতে পারে। এ দ্বারা তুমি আল্লাহ্‌র অশেষ কৌশল আর পূর্ণ ক্ষমতার বিষয়ে অনুমান করতে পার।

চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ـ

'আল্লাহ্' ঘোড়া, খচ্চর আর গাভীও সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তার উপর সওয়ার হও আর সেগুলি তোমাদের সৌন্দর্যের জন্যও।

(সূরা নাহলঃ আয়াত নং–৮)

আল্লাহ্ চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করে মানুষের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ করেছেন। এগুলি মানুষের খুব কাজে আসে। এগুলির দৈহিক গঠন এমন যে, না বেশী শক্ত, যাতে আমরা সহজেই সেগুলি কাজে লাগাতে পারি। আল্লাহ্ এগুলির গোশ্ত, হাড়, শিরা, চামড়া প্রভৃতি খুব মজবুত করে তৈরী করেছেন। যাতে আমরা সেগুলিকে যানবাহনের কাজে ব্যবহার করতে পারি। তাদের সারা দেহ সংরক্ষণের জন্য চামড়াগুলি খুব মজবুত করে সৃষ্টি করেছেন। ফলে বাইরের চাপ ও আঘাত থেকে গোশ্ত রক্ষা পায়। এই পশুগুলিকে কান ও চক্ষু দিয়েছেন, যাতে মানুষ তাদের দ্বারা পূর্ণভাবে কাজ নিতে পারে। যদি এসব প্রাণীর চোখ, কান না থাকতো তবে এগুলির দ্বারা কাজ নেওয়া কষ্টকর হতো। আবার এগুলিকে জ্ঞান–বুদ্ধিও তেমন বেশী দেওয়া হয় নাই, যাতে সেগুলি মানুষের অনুগত আর বাধ্যগত থাকে। যদি এদের জ্ঞান–বুদ্ধি বেশী থাকতো তবে হালচাষ করতে, ভারী বোঝা বহনে, চাকা ঘুরানো প্রভৃতি কষ্টকর কাজ করতে অবাধ্য হতো আর তাদের বশে রাখা যেত না।

আল্লাহ্ খুব ভাল জানেন যে, মানুষের এসব কাজের প্রয়োজন হবে অথচ এগুলি মানুষের শক্তির বাইরে। আল্লাহ্ যদি এসব কাজের জন্য মানুষকে বাধ্য করতেন, তার ফল হতো এই যে, এক দিকে মানুষের পক্ষে এসব কাজ হতো দুঃসাধ্য, অন্যদিকে এসব কাজ করতে গিয়ে তার সব শক্তি যেত নিঃশেষ হয়ে, ফলে জ্ঞান, বিদ্যা অর্জন, মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্য লাভ, পদমর্যাদা উন্নয়ন ও পূর্ণতা অর্জন, যেগুলি মানুষের বৈশিষ্ট্য আর যার জন্য মানুষ সৃষ্টির সেরা ও সম্মানিত সেসব থেকে মানুষ বঞ্চিত হতো। এমনকি মানুষ তার নিজের জন্য সম্মানজনক

উপায়ে নিজের রুজী রোজগার করতে একেবারে অসহায় হয়ে পড়তো। সুতরাং পশুকে এভাবে সৃষ্টি করে আল্লাহ্ মানুষের প্রতি অপার করুণা আর অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, যা সব কাজে লাগানো যায় আর কোন কাজে সে অবাধ্য হয় না।

প্রাণী ও পশুগুলির শ্রেণীবিভাগ আর সেগুলির প্রয়োজনীয়তা এবং কাজের উপযোগিতার বিষয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ মানুষই দেখ না কেন। আল্লাহ্ মানুষকে জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জনের উপযোগী করে সৃষ্টি করেছেন। শিল্প কাজের দক্ষতা ও শক্তি দান করেছেন। আর তাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তার তাকিদে কাপড় তৈরী, গৃহাদি নির্মাণ ও লোহার কাজ প্রভৃতি করাও তার প্রয়োজন। এসব কাজের জন্য আল্লাহ্ মানুষকে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, উদ্ভাবনী শক্তি মস্তিষ্ক আর মননশক্তি দান করেছেন।

শরীরের গঠন ও কাঠামোতেও এসব কাজের প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। হাতে আংগুলী আর পাঞ্জা সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সে কোনো জিনিস ধরতে পারে। আর শিল্প কাজ ও অন্যান্য কাজ করার সময় হাতিয়ার ঠিকভাবে ধরে তা' ব্যবহার করতে পারে। যে সব জন্তু মাংস আহার করে সেগুলির সৃষ্টিনৈপুণ্য লক্ষ্য কর। তাদেরকে শিকার করার আর তা' ধরার পূর্ণ শক্তি ও উপযোগিতা দান করেছেন। সেগুলির হাত পায়ে ধারালো নখ আর পাঞ্জা সৃষ্টি করেছেন, যাতে সুযোগমতো শিকার ধরে কাবু করতে পারে। তারপর তা চিরে–ফেঁড়ে নিজের আহার সংস্থান করতে পারে।

তৃণভোজী পশুগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। কতগুলি পশুর পা এমন ভাবে তৈরী করা হয়েছে যে, কঠিন জমিনের উপর আহারের সন্ধানে চলাফেরার সময় জমির বন্ধুরতা আর কাঁকর প্রভৃতির ঘর্ষণ থেকে যাতে রক্ষা পায়। আর পাথুরে মাটি পা ক্ষত–বিক্ষত না করে। এমনি কোনো কোনো পশুর খুর গোল আর গর্ত বিশিষ্ট করা হয়েছে, যাতে সে জমিনে উত্তমরূপে ভর করতে পারে। আর সওয়ারী বা বোঝা বহনের সময় পা দৃঢ়ভাবে রাখতে পারে।

মাংসভোজী জন্তুগুলির গঠনের প্রতি লক্ষ্য কর। তার দাঁত আর মাড়ি কিরূপ তীক্ষ্ম আর ধারালো করে আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। আর তার মুখের ব্যাদান কত বড় করে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ্ তাকে যে হাতিয়ার দান করেছেন তার সাহায্যে নিজের অন্য শিকার করতে পারে। এর বিপরীত যদি তৃণভোজী প্রাণীর

থাবা আর ধারালো দাঁত হতো আর ধারালো মাড়ি হতো তবে তা হতো একেবারেই বেকার। কেননা তার না শিকার করতে হয় না তার গোশ্ত খাওয়ার প্রয়োজন যে, সে সব ধারালো জিনিসের সাহায্য নেবে। তেমনি যদি মাংসাশী পশুর তৃণভোজী পশুর ন্যায় চামড়া ওয়ালা চোয়াল হতো, যা ঘাস খাওয়ার জন্য প্রয়োজন হয়, তবে তাদের জীবনে ভারী অসুবিধা সৃষ্টি হতো আর তার পক্ষে শিকার করে খাওয়া সম্ভব হতো না।

সুতরাং এবার চিন্তা করে দেখ, আল্লাহ্ প্রত্যেক প্রাণীকে তার প্রয়োজন মাফিক, অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ, শক্তি আর শারীরিক গঠন দান করেছেন। এবার চতুষ্পদ প্রাণীর শাবকগুলির প্রতি লক্ষ্য কর। তারা জন্ম হওয়ার পরই মায়ের সাথে সাথে চলাফেরা করে। মানব শিশুর মতো তাদের লালন পালনের দরকার হয় না এবং কোলে কাঁখে নিয়েও ফিরতে হয় না। এ কারণে মানব শিশু লালন পালনে মা–বাপের যে যত্নাদি ও শিক্ষার প্রয়োজন পশুর বেলায় সে জ্ঞান বুদ্ধির প্রয়োজন নেই আর মানুষের কাজে অন্য যে হাত আর অংগুলি সৃষ্টি করা হয়েছে পশুদের জন্য তারও দরকার নেই। পশুর বাচ্চাদের জন্মের পর স্বাধীনভাবে চলাফেরার শক্তি আল্লাহ্ দান করেছেন। নিজ নিজ শক্তিতেই তাদের মায়েদের সাথে চলাফেরা করতে সক্ষম হয়েই জন্মে।

পাখীর মধ্যে মুরগী, তিত প্রভৃতি পাখীর বাচ্চাগুলি দেখ, তারা ডিম থেকে ফুটবার সাথে সাথেই দানা, খুদ প্রভৃতি খুটে খেতে শুরু করে। আর যে বাচ্চা দুর্বল হয় আর মায়ের সাথে সাথে দানা প্রভৃতি খেতে অক্ষম, যেমন কবুতরের বাচ্চা প্রভৃতি, তাদের মাকে আল্লাহ্ তাদের প্রতি এতটা মেহেরবানী করেছেন যে, তারা নিজেরা সন্তানগুলিকে খাইয়ে পেট ভরায়। নিজের মুখে চিবিয়ে বাচ্চাগুলিকে খাওয়ায়। যতদিন বাচ্চাগুলি নিজেরা চলে ফিরে দানা প্রভৃতি খেতে না পারে ততদিন এভাবেই তাদের খাওয়ান চলতে থাকে। আল্লাহ্ এভাবে প্রত্যেক প্রাণীর ভিতরেই সন্তানের প্রতি কম বেশী মমতা দান করেছেন।

চতুষ্পদ প্রাণীর পাগুলি দেখ! চলাফেরা আর দৌড়ের সময় কি ভাবে তারা সম্মুখের আর পিছনের পা পরস্পর জমিনে ফেলে, যাতে সে টিকে থাকতে পারে। জমিনের পশুগুলি তাদের পা দ্বারা যে কাজ করে পানির জীবগুলো তাদের দেহের অংশ বিশেষ দ্বারা সে কাজ করে থাকে। দু'পা ওয়ালা জীব চলার সময়

যখন এ পা তুলে তখন অন্য পায়ের সাহায্যে মাটির উপর টিকে থাকে; তেমনি চতুষ্পদ বিশিষ্ট প্রাণী চলার সময় যখন দু'পা আগে বাড়ায় তখন পিছের দুপায়ের সাহায্যে টিকে থাকে। আর তা তোলার রীতি হচ্ছে এই যে, সামনের পায়ের যেখানা তুলে পিছনের দিক থেকে তার বিপরীত দিকের একখানা তুলে কেননা একই সময় যদি আগে পিছের এক দিকের পা উঠায় তবে টিকে থাকা সম্ভব হয় না। যেমন চৌকি প্রভৃতি এক দিকে দুপায়ের উপর টিকে থাকতে পারে না। এমন যদি পশু একবার সামনে দু'পা তোলে আর একবার পিছের দু'পা তাতে চলার ব্যতিক্রম ঘটবে আর যানবাহনের কাজ সুষ্ঠু ভাবে চলবে না। এ কারণে আল্লাহ্ তাকে একটা বুদ্ধি দিয়েছেন যে, সামনের দিকের ডান পায়ের সাথে পিছনের বাম পা তুলবে। তাতে সামনে পিছনের বিপরীত পায়ের উপর শরীরের ভার ন্যস্ত থাকবে। তাতে সে সহজে এবং স্বচ্ছন্দে চলতে পারবে। গাধা বোঝা বহন আর চাক্কি ঘুরানোর কাজে আসে। ঘোড়া দ্বারা কেউ এ কাজ নেয় না। আবার উট যদি বেয়াড়া হয় তবে কয়েকজন মিলেও তাকে কাবু করতে পারে না আর যখন তা বাধ্য থাকে তখন ছোট বালকের হাতে লাগাম দিয়ে দাও, সে পিছে পিছে চলে আসবে। অবাধ্য বলদের গর্দানে গরম লোহা দ্বারা দাগ না লাগান পর্যন্ত সে কাবুতে আসবে না। এর পরই তাকে হালে জুড়ে জমি চাষ করান যাবে। ঘোড়া দ্বারা বহনের কাজ হয় এবং যুদ্ধের মাঠে অস্ত্রাদি বয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে খাটান হয়। ছাগলের পাল একটি ছোট বালকও মাঠে নিয়ে চরায় আবার যখন তা চারদিকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তখন তাদের একত্র করা বড় কঠিন হয়ে পড়ে। এমনি সব পশুরই এক অবস্থা অর্থাৎ তাদেরকে আল্লাহ্ ততটা জ্ঞান ও চেতনা দান করেছেন যাতে মানুষের সেবার বেলায় তারা কোনো প্রতিবন্ধক না হয। তাদের জ্ঞান বুদ্ধি তেমন থাকলে কখনো তারা মানুষের বাধ্যগত হতো না, তা যতোই চেষ্টা সাধ্য করতো না কেন।

হিংস্র জন্তুগুলির বেলায়ও তাই। যদি তাদের জ্ঞান বুদ্ধি তেমনি থাকতো তবে অহরহ মানুষের প্রতি হামলা করতো। তাদের ঠেকাতে মানুষের খুবই বেগ পেতে হতো। বিশেষ করে যখন সেগুলি ক্ষুধার তাড়নায় ঘুরে বেড়াতো তখন মানুষের পক্ষে বাইরে বের হওয়া দুঃসাধ্য হতো। এ কারণে তাদের শক্তি ও সামর্থ্য বেশী দিলেও জ্ঞান থেকে বঞ্চিত রেখেছেন আর তাদের অন্তরে মানুষের ভীতি দান করে মানুষের প্রতি খুবই দয়া করেছেন।

কুকুর দেখ। তাও এক প্রকার হিংস্র প্রাণী; তা মানুষের কত অনুগত হয়ে থাকে। মনিবের ঘর পাহারা দেয়, মনিবের জন্য তারা রাত জেগে থাকে, এমনিক প্রাণ দেয়। প্রতিটি আশংকা আর ভয়ের ক্ষেত্রে মালিককে তারা ঘেউ ঘেউ শব্দে সজাগ করে রাখে। মালিক সজাগ সচেতন হয়ে সাবধান সতর্ক হয়ে নিজেকে আশংকা আর বিপদ থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। কুকুরের কি ধৈর্য, কয়েক বেলাও না খেয়ে কাটাতে পারে। কিন্তু নিজ মালিককে ছেড়ে যাওয়া পছন্দ করে না। মালিক তার প্রতি যতোই জুলুম করুক বা মারুক পিটুক তা' সত্ত্বেও সে মালিককে ছেড়ে যায় না। মানুষের উপকারের জন্য আল্লাহ্ কুকুরের মধ্যে এসব গুণ সৃষ্টি করে দিয়েছেন। শিকারের বেলায় কুকুর খুবই কাজে আসে। শিকারকে দাঁত আর নখ দ্বারা মনিবের জন্য আটকে রাখে। মানুষের উপকারের জন্য খোদা কুকুরের মধ্যে এসব গুণ দিয়েছেন।

দেখ চতুষ্পদ প্রাণীর পিঠ আল্লাহ্ কিরূপ সমতল আর চার পায়ের উপর দৃঢ়ভাবে তৈরী করেছেন, যাতে যানবাহনের ক্ষেত্রে সওয়ারী বা মালপত্র গড়িয়ে পড়ে না যায়।

পশুর যোনীদেশ পশ্চাৎ দিকে খোলা সৃষ্টি করা হয়েছে, যাতে পুরুষ পশু সহজে সংগম করতে পারে। যদি মানুষের ন্যায় ভিতর দিকে যোনী হতো তবে পশুর পক্ষে সঙ্গম করা অসম্ভব হতো। পশু সংগমের বেলায় সামনা সামনি হয়ে আসে না। যেমন মানুষের ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যদিও হস্তিনীর যোনী ভিতরের দিকে কিন্তু তা সংগমের সময় বাইরে নিয়ে আসে যাতে পুরুষ হস্তী সহজে সংগম করতে পারে।

পশুর যোনীদেশ আল্লাহ্ এমন ভাবে সৃষ্টি করেছেন সেই হিসাবে তাদের কতগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও দান করেছেন, যাতে তাদের সংগম কাজ সহজ আর তাদের বংশধারা অব্যাহত থাকে।

পশুর দেহ কিভাবে পশম দ্বারা আবৃত করে সৃষ্টি করা হয়েছে। এর ফলে তারা শীততাপ থেকে রক্ষা পায়। পা গুলিতে দৃঢ় খুর আর নখ সৃষ্ট করা হয়েছে, যাতে সুদূর বন্ধুর পথে চলার সময় পা ক্ষত-বিক্ষত না হয়ে যায়।

পশুগুলিকে জ্ঞান, বুদ্ধি, হাত, অঙ্গুলি প্রভৃতি দান করা হয়নি, যেগুলি তার কাজে আসতে পারতো, কিন্তু আল্লাহ্ তাকে সে অভাব মোচন করে দিয়ে তার অসুবিধা লাঘব করেছেন। তার পোশাক, পরিচ্ছদ তার দেহের সংগেই সৃষ্টি করেছেন যা কখনো খোলা বা পরিধান করার প্রয়োজন নেই, আর নেই পরিবর্তন করার ঝামেলা। মানুষের বেলায় এর বিপরীত–আল্লাহ্ তাকে জ্ঞান বুদ্ধি দিয়েছেন, দিয়েছেন হাত পা যা দ্বারা সে তার সব কাজ সমাধা করতে পারে। এ কারণে তার কাজ কর্মও তেমনি। তার মধ্যে ভাল মন্দের প্রেরণা দিয়েছেন, তবে ভালোর চেয়ে মন্দের প্রবণতা অধিক। মানুষের মধ্যে এমন গুণ ও যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন যাতে সে ধ্বংস আর বিপদ হতে রক্ষা পেতে পারে।

মানুষকে আল্লাহ্ সকল প্রাণী ও সৃষ্টির মধ্যে সম্মানিত ও সেরা করেছেন। তাকে বহু কল্যাণ ও অনুগ্রহে ধন্য করেছেন। তার মধ্যে রুচি ও পছন্দ দান করেছেন। বস্ত্র ও পোশাক–পরিচ্ছদের মধ্যে যেটি তার রুচি মাফিক সেটি সে পরিধান করে, যেটি যখন ইচ্ছা পরিবর্তন করে। এবাবে সে নিজেকে সুন্দর হতে সুন্দরতর করে সাজাতে পারে। তারপর পারে অধিক সাজ গোছের জন্য তার বন্ধুর স্বজনের সমাবেশে দামী দামী সৌখিন পোশাক–পরিচ্ছদ পরিধান করে আতর, সুগন্ধি প্রভৃতি ব্যবহার করে। এসব আল্লাহ্রই মহা অনুগ্রহ। মানুষের সাজ–সজ্জার জন্য কত যে উপকরণ সৃষ্টি করেছেন আর সে সব ব্যবহারের জন্য মানুষকে দিয়েছেন জ্ঞান আর বুদ্ধি, আর তার ইখতিয়ারও দিয়েছেন! অন্যান্য প্রাণীর বেলায় রয়েছে এর ব্যতিক্রম। তাদেরকে আল্লাহ্ এসব গুণ থেকে বঞ্চিত রেখেছেন।

দেখ পশুগুলিকে আল্লাহ্ আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ জ্ঞান দান করেছেন। তারা আত্মরক্ষার জন্য বনে–জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। যদি সামান্য ভয়ের কারণ দেখা দেয় তবে অতি গোপন স্থানে গিয়ে গা ঢাকা দেয়। আর আমরণ সেখানে লুকিয়ে থাকে। এ যদি মিথ্যা হবে তবে সহস্র সহস্র প্রকারের বিরাটকায় হিংস্র আর অহিংস্র পশুগুলি কোথায়? তুমি তালাশ কর। বহু চেষ্টা করেও একটির সন্ধান পাবে না। আর এও সত্য নয় যে, তাদের সংখ্যা একেবারে কম এ কারণে দেখা যায় না। বরং যদি কেউ বলে যে, তাদের সংখ্যা মানুষের চেয়ে বেশী তা বাড়াবাড়ি হবে না। কেননা বড় বড় বিশাল অরণ্যগুলি হিংস্র প্রাণী বন্য গাই

এবং গাধা খচ্চর, বকরী, শূকর, চিতা, সহস্র প্রকারের কীট-পতঙ্গ, সরীসৃপ প্রাণী আর নানা জাতীয় পাখীতে পরিপূর্ণ। এগুলি রোজ হাজার হাজার জন্ম নিচ্ছে আর, মরছে, অথচ এদের কংকালগুলোও দেখা যায় না বা তাদের মরে পড়ে থাকতেও নজরে পড়ে না। আল্লাহ্ তাদের প্রকৃতি এমনি তৈরী করেছেন যে, যদি কোথাও তাদের জীবন নাশের সামান্য আশংকা হয় তবে তারা একান্ত গোপনীয় স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেয় আর মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই কাটায়। এবার ভেবে দেখ, এসব বিরাট জন্তু তাদের মৃতদেহে দাফন করার কি পন্থা অবলম্বন করে থাকে। আল্লাহ্ তাদেরকে কি কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন।

এসব চতুষ্পদ প্রাণীর তীক্ষ্ম দৃষ্টিশক্তির প্রতি লক্ষ্য কর। তারা দূর থেকে পথের বাধা-গুহা গর্তে পড়ে জীবন হারানো থেকে নিজকে রক্ষা করে, সামনে যদি কোন বিপদজনক কিছু দেখতে পায় সহসা সেদিক থেকে অন্যদিকে মোড় নেয় এবং নিজকে রুখে নেয়। তাদের অনেকগুলি পিছনের বিপদ সম্পর্কে খবরদার থাকে না, যা অবশ্য তাদের জন্য অনিবার্য হয়ে পড়ে এবং প্রকাশ্য দৃষ্টিতে তা দেখতে পায় না। যাই হোক, আল্লাহ্ তাদের মধ্যে প্রয়োজনীয় সতর্কতা আর দূরদর্শিতা আবশ্যক পরিমাণ দান করেছেন, যাতে তারা বিপদ ও মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে।

এদের মুখের গঠনের প্রতি লক্ষ্য করে দেখ। নীচের দিকটা কিরূপ খোলা, যাতে খাদ্য, দানা প্রভৃতি সহজে চর্বণ করতে পারে। যদি তাদের মুখের গ্রাস মানুষের ন্যায় হতো তবে তারা মাটি থেকে কোন জিনিস খেতে পারতো না। আবার খাওয়ার সময় জিনিস মুখে তুলতে ঠোঁটের সাহায্যের জন্য তা বিশেষ ধরনের সৃষ্টি করা হয়েছে। ঠোঁটের সাহায্যে নিকটের খাদ্য তুলে নিতে পারে আর যা খাদ্য নয়, তা সরিয়ে দিতে পারে। এদের পানি পান করা লক্ষ্য কর, কত ধীর শান্তিভাবে চুমুক দিয়ে পানি পান করে। তাদের মুখের উপর লোমগুলি সৃষ্টির রহস্য চিন্তা কর। পানি পানের সময় পানির সাথে খড়কুটো ভেসে থাকে। তা সেই লোমের দ্বারা পৃথক করে দেয়। আর তার বিশেষ নড়া-চড়ায় পানিকে পরিষ্কার করতে থাকে। ফলে ঘোলা ময়লা পানি এদিকে সেদিকে সরে যায় আর পরিষ্কার পানি পান করতে পায়। পশুর লেজের রহস্য ভেবে দেখ। আল্লাহ্ ওটা তার একটা পর্দা বা আবরণস্বরূপ সৃষ্টি করেছেন, যাতে পশম রয়েছে, যা

পশুযোনীর পর্দার কাজ করে। তা ছাড়া যোনী-অংগে আর পাছায় কিছুটা ময়লা লেগে থাকার কারণে মশা মাছি এসে পড়ে, লেজ দ্বারা সেগুলি বিতাড়িত করা হয়। পশুর লেজ অনেকটা লম্বা ছড়ির ন্যায়। তা দ্বারা সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মাছি বা কীট পতঙ্গ তাড়ায়ে দেয়। মুখের দিকে মশা মাছি বসলে তা মস্তক নেড়ে তাড়ায়। চতুষ্পদ প্রাণীর দেহে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, সে শরীরের যে স্থানে লেজ পৌছতে পারে না বা মাথা নাড়িয়ে তাড়াতে পারে না, সে স্থানে সে সঞ্চালন করতে পারে যাতে মশা মাছি উড়ে যায়। এটা আল্লাহ্র এক বিশেষ কৌশল। যেখানে লেজ বা মাথা পৌছে না সেখানের মশা-মাছি এভাবে তাড়িয়ে থাকে।

এসব চতুষ্পদ প্রাণীর মধ্যে আল্লাহ্ আর একটি গুণ দিয়েছেন। তা হচ্ছে এই যে, তাদের খুব ক্লান্তি আর অবসাদ বোধ হলে দেহের ডান ও বাম পার্শ্ব সঞ্চালিত করে থাকে। এতে তাদের অনেকটা ক্লান্তি কেটে যায়। তাদের সারাটা শরীর হাত পায়ের উপর অবস্থিত। কাজেই তাদের শরীরে মশা মাছি বসলে চুলকানো সম্ভব হয় না। সুতরাং তাদের লেজ ও দেহ সঞ্চালনের মধ্যে আল্লাহ্ শরীর চুলকানোর ব্যবস্থা রেখেছেন। এরূপ অবস্থায় খুব দ্রুত লেজ সঞ্চালন করে নেয়, যাতে দীর্ঘ সময় চুলকানীর ক্লেশ ভোগ করতে না হয়।

এদের আর একটা স্বভাব লক্ষণীয় যে, যখন এরা কাদা পানির সম্মুখীন হয়ে পড়ে এবং তা এড়িয়ে চলার উপায় না থাকে, তখন তারা লেজ উচিয়ে চলে, যাতে লেজ কাদা পানিতে মেখে না যায়। আবার যখন এদের কোন ঢালু স্থান থেকে নামতে হয় আর পিঠে বোঝা চাপানো থাকে তখন তা পড়ে যাওয়ার আশংকা হয়। তখন এরা মাথা এমনভাবে গুটিয়ে রাখে, যেন মাথাটি বাঁচতে পারে আর লেজ দ্বারা বোঝাগুলি আগলিয়ে রাখে, যাতে তা পড়ে না যায়। যদি ঘটনাক্রমে বোঝা পড়েও যায় তবুও যেন মাথায় আঘাত না পায়। আল্লাহ্ এদের মধ্যে এ জ্ঞান ও অনুভূতি দান করেছেন, যা তার নিজের বাঁচার জন্য প্রয়োজন।

হাতির শুঁড় দেখ। কিভাবে তার দ্বারা হাতের কাজ হইতেছে। এরই সাহায্যে তার খাদ্য আর দানা-পানি মুখে তুলে দেয়। যদি তা না হতো তবে তার ভারী অসুবিধা হতো। মাটি থেকে কিছু তুলতেই পারত না। কেননা হাতি অন্যান্য পশুদের ন্যায় মাথা নাড়াতে পারে না। এ কারণে আল্লাহ্ তাকে শুঁড়টি দিয়ে বড় অনুগ্রহ করেছেন। আবার শুঁড় পাত্রের কাজ দেয়। হাতি শুঁড়ে পানি পুরে মুখে

নিয়ে যায়। আবার এটি নাকের কাজ করে। এরই মাধ্যমে শ্বাস গ্রহণ করে। আবার এটি তার হাতের কাজ করে। এর সাহায্যে বোঝা তুলে পিঠের উপর রাখে। আবার সওয়ারী অনেক সময় শুঁড় ধরে পিঠের উপর আরোহণ করে। জিরাফ, যার ঘাড় অতি দীর্ঘ, দেখতে অনেকটা উটের মতো। তা আফ্রিকার গহীন অরণ্যে বাস করে উঁচু উঁচু বৃক্ষের ঘন জংগলে তার বাস বলে। আল্লাহ্ তার গর্দান খুব লম্বা করেছেন, যাতে সে উঁচু বৃক্ষের পাতা আর ফল খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে।

খেঁকশিয়াল মাটির ভিতরে গর্ত খুঁড়ে তাতে বাস করে। গর্তে আসা যাওয়ার দুটি পথ থাকে। গর্তটি খুবই সংকীর্ণ করে তৈরী করে। দুটি রাস্তা এ কারণে যে, যদি একদিক থেকে তাকে কেউ পাকড়াও করার চেষ্টা করে, তবে অপর রাস্তা দিয়ে সে বেরিয়ে পালায়। যদি উভয় পথ দিয়ে তাকে আটক করার চেষ্টা করা হয় তখন সে একটি পথ মাথা দ্বারা আটকিয়ে দেয় আর তার নীচ দিয়ে এমনই গর্ত খুঁড়ে রাখে যা দিয়ে সে পালাতে পারে। দেখ, আল্লাহ্ এই ইতর প্রাণীকে নিজ জীবন রক্ষার জন্য কতটা হুঁশিয়ারি আর জ্ঞান দান করেছেন।

মোটকথা এই যে, আল্লাহ্ এই সব প্রাণীদেরকে বিভিন্ন প্রকৃতি, ভিন্ন ভিন্ন হিকমত ও কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন। যে সব পশুর গোশ্ত আল্লাহ্ মানুষের জন্য হালাল করেছেন, সেগুলোকে আল্লাহ্ অনেক শান্ত ও নিরীহ করে সৃষ্টি করেছেন, যাতে সহজেই মানুষের বশে আসে। যেসব পশুকে আল্লাহ্ যানবাহনের জন্য সৃষ্টি করেছেন, সেগুলোকেও নিরীহ করে পয়দা করেছেন। সেগুলির ক্রোধ ও বেয়াড়ামী নামমাত্র। সেগুলির গঠন ও কাঠামো যানবাহনের উপযোগী করে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেসব জন্তুর মধ্যে বেয়াড়াপনা এবং ক্রোধ বেশী, সেগুলির মধ্যে মানুষের বশ মানার প্রকৃতি দিয়ে আল্লাহ্ পয়দা করেছেন। যাতে সেগুলি মানুষের উপকারে আসে এবং শিকার ও পাহাড়িয়া কাজে লাগান যায়। এমনি হাতি খুবই বুদ্ধিমান প্রাণী, বশ মানার ও শিক্ষা গ্রহণের বিশেষ গুণ রয়েছে। এদেরকে যানবহন আর যুদ্ধক্ষেত্রে রসদ ও অস্ত্রাদি বহনের কাজে খাটানো যায়। যেসব জন্তুর মধ্যে বেয়াড়াপনা আর অবাধ্যতা কম, সেগুলির মধ্যে অন্যান্য পশুর তুলনায় প্রভুভক্তি অধিক, যা মানুষের বিশেষ কাজে আসে। যেমন বিড়াল প্রভৃতি। পাখীর মধ্যে এমন কতগুলি পাখী আছে যে মানুষের বেশ উপকারে আসে। এদের কতগুলির মধ্যে অসাধারণ ভালবাসা ও অনুরক্তি লক্ষ্য করা যায়।

কবুতর এদের মধ্যে অন্যতম, যারা নিজেদের বাসা কখনো ভুলে না। কবুতর দ্বারা সংবাদ আদান–প্রদানের কাজ নেয়া চলে। প্রয়োজনের সময় সেগুলি খুব কাজে আসে। আবার এগুলি খুব বেশী বাচ্চা দেয়। বাজ পাখীর মধ্যে ভালবাসার গুণ রয়েছে আবার তার মধ্যে হিংস্রতাও বিদ্যমান। বাজ যেহেতু শিকার ধরার কাজে আসে এজন্য তার মধ্যে বশ মানার গুণ দিয়ে আল্লাহ্ তাকে সৃষ্টি করেছেন। ফলে তার মধ্যে বশ মানার প্রবণতাটা বেশী আর সে প্রভুর নির্দেশ অনুযায়ী কাজও করে। আর শিকার ধরার বেলায় খুব কাজে লাগে। আরো কত গুণ ও বৈশিষ্ট্য আর রহস্য এ সব প্রাণীদের মধ্যে নিহিত রয়েছে, তা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

মৌমাছি, পিপীলিকা, মাকড়সা, মশা, রেশম কীট আর মাছি প্রভৃতির সৃষ্টি রহস

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طَآئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ - مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ -

এবং পৃথিবীতে এমন কোন বিচরণশীল প্রাণী এবং দুই পাখায় উড্ডয়নশীল পাখী নেই, যাহারা তোমাদের অনুরূপ শ্রেণীবদ্ধ নহে, আমি এই গ্রন্থে কোন বিষয়ই বাদ দেই নাই, অনন্তর তাহারা সকলেই তাহাদের প্রতিপালকের নিকট একত্রিত হইবে। (সূরা আন'আমঃ আয়াত নং ৩৮)

আল্লাহ্র সৃষ্ট ক্ষুদ্র পিঁপড়া দেখ। তাদেরকে কি কৌশলে খাদ্য সঞ্চয় করতে শিক্ষা দিয়েছেন। আর সে কাজে তারা পরস্পর কিভাবে সহযোগিতা করছে। শীত, গ্রীষ্ম আর বর্ষার জন্য যখন তাদের বাইরে বের হওয়া অসম্ভব হয় তখনকার জন্য তারা সবাই মিলে নির্বিবাদে বসে আহার করবে। কতখানি দুরদর্শিতা যা অনেক সময় মানুষের মধ্যেও দেখা যায় না।

পিঁপড়া যখন যে কোন জিনিস একা বহন করতে পারে না, তখন অন্য পিঁপড়ার দল এসে তাকে সাহায্য করে। যেমন মানুষ কোন ভারী জিনিস উঠাতে অক্ষম হলে আর একজন এসে সেটা তুলতে সাহায্য করে।

তারা মাটির ভিতরে কি কৌশলে নিজেদের ঘর–বাড়ী তৈরী এবং একের পর এক মাটি তুলে গর্ত করে। এমনি গর্তটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। গৃহ পরিষ্কার হয়ে গেলে পরে তাতে খাদ্য সংরক্ষিত করে। যেসব দানা তারা জমা করে তা দাঁত দ্বারা টুকরা করে কেটে রেখে দেয় অন্যথায় উহা অঙ্কুরিত হয়ে যেতে পারে। এই সব ক্ষুদ্র প্রাণীর মধ্যে এ জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ্ ব্যতীত আর

কে দান করেছেন। আবার যদি সেই সঞ্চিত খাদ্য পানিতে ভিজে যায় তবে তা বের করে রৌদ্রে বাতাসে শুকিয়ে লয়। তারা নীচু জায়গায় কখনো তাদের বাসা তৈরী করে না। যেহেতু তাতে পানি উঠে তাদের মৃত্যুর কারণ হতে পারে। বরং তারা সব সময় উঁচু স্থানে নিজেদের বাসা তৈরী করে।

এবার মৌমাছি এবং তাদেরকে আল্লাহ্ যে অপুর্ব নৈপুণ্য দান করেছেন, সে বিষয় লক্ষ্য কর। মৌমাছিদের একদলে এক রাজা বা রাণী থাকে। সবাই তারই হুকুমে কাজ করে। যদি অন্য কোন মৌমাছি রাজা বা রাণী হওয়ার দাবী করে তবে সবাই মিলে তাকে হত্যা করে ফেলে, যাতে তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি না হয় আর এক জনের আনুগত্যে সবাই মিলে কাজ করতে পারে।

মৌমাছিরা ফুল থেকে তরল রস চুষে নেয়, যা তাদের মুখে আল্লাহ্র কুদরতে মধুতে পরিণত হয়। এর দ্বারা বোঝা যায় আল্লাহ্ মানুষের উপকারের জন্যই মধু সৃষ্টি করেছেন। এতে রয়েছে রোগ প্রতিরোধক। আল্লাহ্ খোদ বলেছেনঃ 'মধুতে খাদ্য এবং অন্যান্য উপকরণও রয়েছে যেমন রয়েছে দুধের মধ্যে অশেষ উপকারিতা মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জন্য।

মৌমাছিরা পায়ে করে মোম বাসায় এনে মধু রক্ষা করে। মোমের পাত্রের চেয়ে মধু সংরক্ষিত করার উপযুক্ত কোন পাত্রই হতে পারে না।

চিন্তা কর, আল্লাহ্ ছাড়া আর কে মৌমাছিকে এসব শিক্ষা দিয়েছে, যে শিক্ষার মাধ্যমে তারা মধুকে মোমের পাত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সংরক্ষিত করে। আবার তারা উঁচু বৃক্ষ বা পাহাড়ে তাদের চাক তৈরী করে, যাতে লোকের হাত থেকে রক্ষা পায়। মৌমাছিরা দিনের বেলায় মধু আহরণ করার জন্য বের হয়। রাত্রে তারা বাসায় রাত্রি যাপন করে। বাসায় ফিরার সময় তারা নিজেদের খাদ্য মুখে করে নিয়ে আসে।

তাদের গৃহ নির্মাণের কলাকৌশলের প্রতি লক্ষ্য কর। তাতে বিশেষ নিপুণতার সাথে সাত–কোণ বিশিষ্ট খোপ তৈরী করে। পায়খানা করার জন্য গৃহের মধ্যে আলাদা ছিদ্র তৈরী করে। ফলে মধুর সাথে তা মিশে গিয়ে মধু নষ্ট হতে পারে না। বস্তুতঃ মৌচাকের গঠন নৈপুণ্য অতুলনীয় কলা কুশলতার নিদর্শন, যা আল্লাহর অসীম কুদরতের সাক্ষ্য বহন করে।

মাকড়সা

মাকড়সার প্রতি লক্ষ্য কর। আল্লাহ্ এর দেহে এমন এক প্রকার জলীয় পদার্থ সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যদ্দ্বারা সে নিজের ঘর তৈরী করে আর তদ্দ্বারা নিজের আহার সংস্থানের জন্য শিকার ধরার জালও তৈরী করে। এটা আল্লাহ্রই অসীম কুদরত। তবে তার খাদ্যে এমন লালা সৃষ্টি হয়, যদ্দ্বারা তার ঘর আর শিকার ধরার জাল তৈরী হতে পারে। মাকড়সা তার ঘর এমনভাবে তৈরী করে যে, তাতে সে নিজে লুকিয়ে থাকতে পারে। তার লালা অতি সূক্ষ্ম সুতার ন্যায় বের হয়। এর তৈরী জালে শিকার চারদিক থেকে এমনভাবে ফেঁদে যায় যে তার আর ছুটবার সাধ্য থাকে না। এই জালে যখনি কোন শিকার অর্থাৎ মশা, মাছি বা পোকা প্রভৃতি আট্কে যায়, তখন সে দ্রুততার সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে আর চারদিকে চক্কর দিতে থাকে। তারপর খুব সাবধানে ধরে নিজ গৃহে নিয়ে যায়। যদি ভুখা হয় তবে তখনি সে তা খেয়ে ক্ষুধা দূর করে আর যদি ক্ষুধা না থাকে তবে ভবিষ্যতের জন্য তা রেখে দেয়। দেখ, আল্লাহ্ মাকড়সার ন্যায় ইতর প্রাণীকে কত জ্ঞান ও ও কত কৌশল দান করেছেন। আর তার উপায়-উপকরণও দিয়েছেন। এত ক্ষুদ্র ইতর প্রাণীকে আল্লাহ্ যখন এত জ্ঞান ওহিকমত দান করেছেন তখন মানুষের ন্যায় আশরাফুল মাখলুকাতকে কত জ্ঞান কৌশল দান করেছেন তার কুল কিনারা করা সম্ভব নয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ অসীম কুদরত ও হিকমতের অধিকারী।

গুটিপোকা

রেশমের ক্ষুদ্র গুটি পোকাগুলি দেখ। উহার প্রতি নজর করলে খোদার কুদরত বোঝা যায়। তাদের সৃষ্টি মানুষের উপকারের জন্যই। গুটি পোকা নিজ শরীর দ্বারা রেশম তৈরী করে। প্রথমে একটি বীজের ন্যায় উহার আকৃতি হয়। উহা দেখতে ডিমের ন্যায়। কিছুদিন তাপ পেয়ে তা একটি কীটের রূপ ধারণ করে। তারপর এই ক্ষুদ্র কীট তুত পাতার উপর রাখা হয়। পোকাটি সেই পাতা থেকে তার খাদ্য আহরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে একটি রেশমের গুটি তৈরী হয়ে যায়। সে গুটি পোকাটি নিজ দেহের চারদিকে রেশম বুনে। এই তার জীবন।

আল্লাহ্ এই উপকারী জীবটি রক্ষা করার জন্য ব্যবস্থা করেন! যখন রেশমের গুটি তৈরী হয়ে যায়, তখন উহা পাখা বিশিষ্ট একটি পোকা তৈরী হয়ে উড়ে

বেরিয়ে যায়। চেনা যায় না স্ত্রী জাতীয় কি পুরুষ জাতীয়। পোকাটি অনেকটা মৌমাছির মতো দেখতে। এদের স্ত্রী জাতীয় কীট ও পুরুষ জাতীয় কীটের সম্মিলনে অল্প দিনেই ডিম দেয়, এই ডিম পূর্ব বর্ণিত প্রক্রিয়ায় একটি রেশমের গুটিতে পরিণতি হয়।

এবার চিন্তা করে দেখ। এই পোকাকে বিশেষভাবে তুত পাতা আহার করতে কে শিখিয়েছে? আবার রেশম পয়দা করতে নিজ দেহকে বিলীন করতেই বা তাকে কে শিক্ষা দিয়েছে। তারপর তাকে এই আকৃতিতেই বা কে রূপান্তরিত করেছে? কে-ই বা তার মধ্য থেকে পাখা ওয়ালা পোকা সৃষ্টি করেছে, যদ্দ্বারা তাদের বংশ টিকে রয়েছে। যদি সে তার আসল রূপে থাকতো তবে তাদের বংশধারা বিলুপ্ত হয়ে যেত।

অতঃপর যিনি গুটি পোকা হেন ক্ষুদ্র কীট সৃষ্টি করে তাকে এত জ্ঞান বুদ্ধি দান করেছেন আর তার কর্তৃক উৎপন্ন রেশম দ্বারা বহু অর্থ উপার্জনের উপায় শিক্ষা দিয়েছেন, রেশম দ্বারা নানা প্রকার দ্রব্যাদি ও মুল্যবান পোশাক-পরিচ্ছদ তৈরী করা শিখিয়েছেন তার অসীম হেকমত ও কুদরত দেখে বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারা যায় না। গুটি পোকার মৃত্যু আর জন্ম দেখে মৃত্যুর পর পুনর্বার জীবিত হওয়ার আর পচে-গলে যাওয়া হাড়ের নতুন গোশ্ত চামড়া সৃষ্টি হওয়ার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় হয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ এর চেয়েও অধিক কুশল জ্ঞানবান।

মাছি

মাছির প্রতি লক্ষ্য কর। কত ক্ষুদ্র আর প্রকাশ্যতঃ মনে হয় এর দ্বারা কোন কাজ হয় না। মাছির জন্মের সাথে সাথেই তার দেহে পাখা হয়। আর উড়ে গিয়ে খাদ্যের সন্ধান করে। কোন বিপদ দেখলে দ্রুত উড়ে গিয়ে প্রাণ বাঁচায়। আল্লাহ্ মাছিকে ছ'খানা পা দিয়েছেন, চারখানার উপর সে ভর করে চলে আর দু'খানা অতিরিক্ত থাকে, যা আবশ্যক মতো ব্যবহার করে। যেমন—যদি কোন রকম জিনিসের উপর বসে আর তাতে ডানা জড়িয়ে যায় তখন তা সাফ করার জন্য অতিরিক্ত পা দুখানা কাজে লাগায়। এদের চক্ষু সে সব কীট পোকার ন্যায় পলকবিহীন যেগুলি সর্বদা এদের চক্ষু সে সব কীট পোকার ন্যায় পলকবিহীন যেগুলি সর্বদা মানুষের শান্তিতে বিঘ্ন ঘটায়। আর তা মাথা থেকে বাইরে বের

হওয়া। এমনি মশা প্রভৃতি প্রাণীগুলিকে মানুষের পিছে নিয়োজিত করে রেখেছেন, যাতে মানুষ কখনো নিরবচ্ছিন্ন শান্তি ভোগ করতে না পারে। ফলে মানুষ এই জীবনের নশ্বরতা অনুভব করে। আর এই অশান্তিময় জগত ছেড়ে যাওয়ার ইচ্ছা হয়। কেননা এই অতি সামান্য ইতর প্রাণী বারবার তাড়ানোর পরও মানুষের গায়ে এসে বসে যেন মানুষের দেহটা একটা চেতনাহীন প্রস্তরবত। কিছুক্ষণ বসে একটু ঘুরাফেরা করে আবার এসে বসে। কেননা শিকার সেটাই করা হয় যেটা জীবিত বলে জানা যায়; মৃতকে কেহ শিকার করে না। যেমন—পাথর, কেউ তাকে লক্ষ্যবস্তু করে না।

কাক দেখ, কাক এমনিতেই অবাঞ্ছিত পাখী। আর তার প্রকৃতিও এনমভাবে সৃষ্ট যে, সে থাকেও একটু দূরে দূরে। মনে হয় যেন সে কিছু গায়েব জানে। যদি কেউ তাকে ধরার কথা চিন্তা করে অমনি উড়ে পালায়। তার জ্ঞান এত পাকা যে, তার বাচ্চার জন্য খুব আড়ালে বাসা তৈরী করে। তারা খুব কমই স্ত্রী–পুরুষে মিলিত হয়, কি জানি সে অবস্থায় যদি ধরা পড়ে যায়। মোটকথা, সে মানুষ থেকে সর্বদা ভীত আর খুব সাবধান সতর্ক থাকে। কিন্তু চতুষ্পদ প্রাণী কিংবা অন্যান্য প্রাণীর বেলায় অবস্থা একেবারে বিপরীত। কাক তাদের পিঠে, শিং–এ বা ঘাড়ের উপর অনেকক্ষণ ধরে বসে থাকে, উটের রক্তে, আর গোবরাদির মধ্যে তারা অনেক খাদ্য খোঁজে। কাকের ক্ষুধা নিবৃত্ত হলে অবশিষ্ট খাদ্য কোথাও লুকিয়ে রাখে, যা অন্য সময় খায়। বলো এদের মধ্যে কে এই প্রকৃতি আর চেতনা দান করেছেন। অসীম কুদরতের অধিকারী এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কে আছে এমন হিকমত ও কুদরতওয়ালা, যদিও এসব ইতর প্রাণীর জ্ঞান বলতে নেই।

চিল এক পাকী যা দেখতে সুন্দর নয়। তাও মানুষ থেকে খুব নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। আল্লাহ্ তাকে উড়ার অসামান্য ক্ষমতা দান করেছেন। আকাশের বহু উচ্চে সে উড়ে বেড়ায়। তার দৃষ্টিশক্তি এত তীক্ষ্ণ যে, বহু উপর থেকে জমিনের খাদ্য সে দেখতে পায় আর দ্রুত ছোঁ মেরে তুলে নেয়। তার পাঞ্জা খুব ধারালো আর বাঁকা। এর সাহায্যে সে মাটি থেকে তার শিকার ধরে নেয় আর প্রায়ই লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না।

চিল দেখ, যখন সে কচ্ছপ শিকার করে আর দেহে এমন স্থান না পায় যে যা সে আহার করতে পারে, তখন সে তাকে চংগলে ধরে অনেক উঁচুতে নিয়ে যায়।

তারপর তাকে পর্বত অথবা কঠিন মাটিতে ছেড়ে দেয়, যার ফলে তার শরীর ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়। এবার চিল তাকে আহার করে। বলো চিলের মধ্যে কে এই জ্ঞান দান করেছে?

আর এক জীব হচ্ছে গিরগিট, যাকে রক্ত শোষা বলা হয়। এটা একটা অদ্ভুত প্রাণী, সে একই স্থানে বসে থাকে। চলাফেরা খুব কমই করে। আল্লাহ্ তার চোখে এমন গুণ দিয়েছেন যে সে একই সময় চারদিকে দেখতে পায়। সে একই জায়গায় বসে তার আহার সংস্থান করে। ছোট ছোট কীট পোকা ধরে খায়। তার একটি বৈশিষ্ট এই যে, যে গাছের উপর সে বাস করে সে রং এ সে পরিবর্তিত হয়, তাকে সহজে চেনা যায় না। মশা মাছি তাকে দেখতেই পায় না। সে বসে বসে জিহবা বের করে আর বিজলী গতিতে পোকা–মাকড় গিলে খায়। গাছের কোন ডালের উপর এমনভাবে চুপটি মেরে বসে যায়, যেন তা ডালেরই একটি অংশ।

এই জীবটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো যদি তাকে কেউ মারতে যায় তবে তাকে ভয় দেখাবার জন্য নানা রং ও রূপে পরিবর্তিত হয় যা দেখে সে ভয় পায়। রূপ পরিবর্তনে সে একটা দৃষ্টান্ত স্বরূপ। যদি কেউ বারবার মত ও ধারণা পরিবর্তন করে তবে তাকে এই জীবটির তুলনা দেওয়া হয়।

মাছিদের মধ্যে আর এক প্রকার মাছি রয়েছে, যা সাধারণ মাছি থেকে একটু ভিন্ন ধরনের। এরা সাধারণ মাছিগুলি খায়। সে শিকার করার জন্য আশ্চর্য কৌশল অবলম্বন করে। কোনো মাছি তার কাছে এসে বসলে সে একেবারে মরার ন্যায় অচেতন হয়ে পড়ে। যখন তার বিশ্বাস হয় যে এবার সে ঠিকভাবে স্থির হয়ে বসেছে, তখন খুব সাবধানে তার নিকটে গিয়ে হঠাৎ তাকে জাপ্‌টিয়ে ধরে ফেলে, তারপর যখন সেটি একদম মরে যায় তাকে আহার করে। সামান্য মাছির যে এই হিকমত আর কৌশল তখন এগুলি তার নিজের জ্ঞান, না তার জীবিকা অর্জনের জন্য মহা কুশলী আল্লাহ্‌র দান।

মশা দেখ, কতো ক্ষুদ্র প্রাণী, আল্লাহ্ তাকে কত ক্ষুদ্র করে সৃষ্টি করেছেন। এতো ক্ষুদ্র দেহ হওয়া সত্ত্বেও তার পাখা আর পায়ে কোনো ত্রুটি বা কমতি নেই, না আছে তার দৃষ্টিতে কোনো অভাব, যার সাহায্যে সে যথাস্থানে বসে থাকে। এই ক্ষুদ্র দেহে এমন হাতিয়ারও রয়েছে যার সাহায্যে সে অন্যের শরীর বিদ্ধ করে রক্ত চুষে নেয়। এই ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে খাদ্য হজম করার সব যন্ত্রাদি

মজুদ রয়েছে। আবার মল–মূত্র নির্গমণেরও ব্যবস্থা রয়েছে। তা খেয়ে কি তার বাঁচা সম্ভব? আর এও কি সম্ভব যে সব সময় তার খাদ্য একই স্থানে জুটবে? বোঝা যায়, এই ক্ষুদ্র প্রাণীর দেহে সব ব্যবস্থাই মহা কৌশলী আল্লাহ্ সৃষ্টি করেছেন। তার প্রাণীর দেহে সব অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দান করেছেন এবং তার আহার সংস্থানে জ্ঞান ও কৌশল দান করেছেন। লাভক্ষতির মধ্যে পার্থক্য করার সহজাত বৃত্তি আল্লাহ্ তাকে দিয়ে দিয়েছেন। এতে নিদর্শন রয়েছে আল্লাহ্র সৃষ্টি নৈপুণ্যের। যদি মশা বাহ্যত একটি অতি নগণ্য প্রাণী তা সত্ত্বেও আসমান জমিনের মানুষ ও ফেরেশ্‌তা সবাই জানার চেষ্টা করে যে, আল্লাহ্ কিভাবে তার দেহের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বিন্যাস করেছেন আর কিভাবে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তা তাদের পক্ষে অসম্ভব হবে এবং অক্ষমতা জ্ঞাপন করা ছাড়া উপায় থাকবে না। তারপর চিন্তা কর যে, মশার এই ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে আল্লাহ্ যে শক্তি দান করেছেন, যার ফলে সে জানতে পারে যে, অন্য প্রাণীর চামড়া আর গোশ্‌তের মাঝখানে রক্ত রয়েছে যা তার খাদ্য। যদি পূর্বেই এই তত্ত্ব তার জানা না থাকতো তবে কখনো অন্য প্রাণীর শরীর থেকে রক্ত শোষণের চেষ্টা করতে না; আবার তার হিম্মত দেখ, প্রথমে সে কিভাবে তার নির্দিষ্ট বাঁশী বাজিয়ে তার উপস্থিতি ঘোষণা করে আর নিজেও থাকে সাবধান, সামান্য ভয় পেলেই উঁড়ে পালায়। সে জানে উড়ে যাওয়ার মধ্যে তার মুক্তি। আর যখন সে উড়ে চলে তখন কেউ তাকে ফিরিয়ে আনতে পারে না। দেখ সামান্য একটি মশার মধ্যে আল্লাহ্ এত নৈপুণ্য নিহিত রেখেছেন তখন অন্যান্য অগণিত প্রাণীর মধ্যে কত না হিকমত রহস্য নিহিত রেখেছেন তা একমাত্র মহাজ্ঞানী আল্লাহ্ই জানেন।

মৎস্য সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَهُوَ الَّذِىْ سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوْا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا۔

সেই আল্লাহ্ যিনি তোমাদের জন্য সমুদ্র বাধ্যগত করেছেন যা থেকে তোমরা খাদ্য মাংস খাও।

(সূরা নাহালঃ আয়াত নং ১৪এর অংশ)

আল্লাহ্ সমুদ্রে আর নদী–নালায় কত বিচিত্র গঠনের ও আকৃতির মৎস্য সৃষ্টি করেছেন, তার প্রতি লক্ষ্য কর। এদের সৃষ্টি নৈপুণ্যে আল্লাহ্র অসীম কুদরত লক্ষ্য করা যায়। মৎস্যকে আল্লাহ্ পানিতে বসবাসকারী করে সৃষ্টি করেছেন বলে তাদের পা আর ফুসফুস সৃষ্টি করেন নি। কেননা, মাছ পানির মধ্যে থাকা কালে শ্বাস নেয় না। পায়ের বদলে আল্লাহ্ তাদের দেহে ডানা সৃষ্টি করেছেন বা দ্রুত সঞ্চালন করে যেদিকে ইচ্ছা যেতে পারে। মাছের শরীরে আল্লাহ্ খুব শক্ত ধরনের খোলস সৃষ্টি করেছেন। এগুলি একটির কতকাংশ অপরটির মধ্যে প্রবিষ্ট। এদ্বারা তাদের দেহ আবৃত এবং রক্ষিত থাকে। যেসব মাছের দেহে খোলস হয় না, সেগুলির শরীরে একটা সিলকার ন্যায় থাকে অথবা তাদের চামড়া খুব পুরু ও মজবুত, যা তাদের পুরোপুরি রক্ষা করার কাজে আসে।

মাছের চোখ কান নাক সবই আছে। এর সাহায্যে সে তার আহার তালাশ করে খায় আর বিপদের সময় আত্মরক্ষা করে। সুতরাং দেখ সমুদ্র আর নদী–নালার মধ্যে বসবাসকারী প্রাণীগুলিকে আল্লাহ্ কিভাবে প্রয়োজনীয় অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দান করেছেন যার দ্বারা তারা খাদ্যের সংস্থান করে আর বিপদ থেকে আত্মরক্ষার পুরো কাজে আসে। আল্লাহ্ ভালই জানেন যে, মাছ পরস্পরকে খায়, এজন্য তাদের পোনা বাচ্চা জন্মে অসংখ্য। আর তাদের স্ত্রী বা পুরুষ জাতের কোন পার্থক্য নেই। যেমন স্থলচর প্রাণীর মধ্যে স্ত্রী–জাতীয়গুলির ডিম বা বাচ্চা দেয়। মাছের বেলায় রয়েছে তার ব্যতিক্রম, সব মাছই ডিম দেয়। আর প্রত্যেক মাছের

পেটেই একটা বা দুটো করে ডিমের ছড়া থাকে, যাতে অসংখ্য বাচ্চা পয়দা হয়। আবার কতগুরি মাছের দু'হাত দু'পা থাকে। তাদের পুরুষ ও স্ত্রী–জাতীয় মিলনে বংশ সৃষ্ট হয়।

কচ্ছপ জাতীয় অন্যান্য কতগুলি পানিতে বসবাসকারী প্রাণী ডিম দেয়। সূর্যের তাপে তাদের ডিম ফুটে। তা থেকে একটি মাত্র বাচ্চা জন্মে। পানির ভিতরে ডিম তা দেওয়া সম্ভব নয়। এ কারণে মাছের ডিম ছাড়ার সাথে সাথে তাদের বাচ্চাগুলির জীবন লাভ হয়। তাতে একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা পয়দা হয়, তারা নিজেদের প্রতিপালনে কারো মুখাপেক্ষী হয় না। কেননা স্থলচর প্রাণীর ন্যায় সমুদ্রের আর নদী–নালার প্রাণীদের পক্ষে ডিমে তা দিয়ে কয়েকদিন বসে তারপর বাচ্চা ফুটলে তাদের আহার করান অসম্ভব ব্যাপার। আল্লাহ্ এজন্য তাদেরকে এসব কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন। মাছের পোনা ফুটে অসংখ্য। কিন্তু এক মাছ অন্য মাছ খেয়ে ফেলে। তাই অনেকই নষ্ট হয়ে যায়।

মাছের দ্রুতগতির প্রতি লক্ষ্য কর। কত দ্রুত তারা লেজ সঞ্চালন করে। পানির মধ্যে তাদের গতি কত সুন্দর ও সাবলীলভাবে নৌকার ন্যায় সাঁতার কেটে পা আর পাখা দ্বারা পানি সরিয়ে অগ্রসর হ'য়ে যায়। মাছের দেহের হাড় কাটা খুবই হালকা, চিকন এবং ফাঁপা কেননা, সাঁতার কাটার জন্য এমনই হওয়া বাঞ্ছনীয়। কোথাও কোন হাড় ভেংগে গেলে আবার তা মাংসের সাহায্যে সেরে উঠে। মাছের দাঁতের সংখ্যা বহু তবে খুব ঘন সন্নিহিত হওয়াতে একটিই মনে হয়। আর চর্বণের সময় সবগুলি দাঁতই এক সঙ্গে কাজ করে বলে বেশী চিবানোর দরকার হয় না।

শামুক

সমুদ্রে আল্লাহ্ বহু দুর্বল্ল প্রাণীও সৃষ্টি করেছেন। সেগুলি ভালো করে চলাফেরাও করতে পারে না যেমন শামুক আর ঝিনুক প্রভৃতি। তাদের আত্মক্ষার জন্য আল্লাহ্ খুব সুদৃঢ় দুর্গের ন্যায় আশ্রয় সৃষ্টি করে দিয়েছেন, যেগুলি পাথরের ন্যায় শক্ত। সেটাই তার ঘর–বাড়ী। এর ভিতরের অংশ যেটা শরীরের সাথে সংযুক্ত, সেটা নরম। যাতে তার শরীরে আঘাত না লাগে তাই শক্ত আবরণ।

শামুক অনেক প্রকার। কতগুলি এমন যে, সেগুলি একদম খোলা জায়গায় থাকে আর নিজের আত্মরক্ষারও কোন ব্যবস্থা করতে পারে না এ কারণে এগুলিকে আল্লাহ্ পাহাড় আর ময়দানে সৃষ্টি করেছেন যাতে তারা বাঁচতে পারে। সেই পাহাড়ের নিঃসৃত পানিই তাদের খাদ্য।

এদের কতগুলি দেখতে খুবই সুন্দর আর তারার ন্যায় উজ্জ্বল। এরা খাবার জন্য নিজ আবরণের বাইরে মুখ বের করে খায় আবার কোনো ভয়ভীতি দেখা দিলে হঠাৎ মুখ ভিতরে নিয়ে যায়, আর ছিদ্রের মুখ এমনভাবে বন্ধ করে ফেলে যাতে তার ভিতরে কিছু যেতে না পারে। এভাবে সে চারদিক দিয়ে বেষ্টিত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ্র কুদরত দেখ! কিভাবে আল্লাহ্ তার ঘর নির্মাণ করেছেন আর তার আত্মরক্ষার কি কৌশল তাকে শিক্ষা দিয়েছেন। মোটকথা, আল্লাহ্ কাউকে বঞ্চিত করেন নাই; প্রত্যেককেই তার প্রয়োজনীয় অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ দান করেছেন। আল্লাহ্ তার সকল সৃষ্টিকেই পুরোপুরি রক্ষা করে থাকেন, তারা পাহাড়ে, টিলায় বা সমুদ্রে যেখানেই বাস করুক না কেন?

রংগীন মাছ

মাছও নানা প্রকারের দেখতে পাওয়া যায়। কতগুলি সমুদ্রের তলা থেকে খাদ্য আহরণ করে। আবার কতগুলি নদী বা সমুদ্রের কুলে অল্প পানিতে নিজেদের আহার খোঁজ করে নেয়। কতগুলি মাছের গায়ে বিচিত্র নকশা আর রং হয়ে থাকে। এগুলি খাদ্যের কারণেই তৈরী হয়। যেমন তৃণভোজী পশুর পেটে পরিষ্কার দুধ সৃষ্টি হয়।

রংগীন মাছ যখন অনুভব করে যে, তার দেহের রং–এ কোন পরিবর্তন ঘটছে তখন সে তার পেট থেকে বিশেষ ধরনের দ্রব্য বের করে পরিষ্কার করে ফেলে, তারপর পানির ভিতরে গিয়ে তা পরিবর্তন করে। এসব হাজার হাজার কুদরতের কারিগরি আর রহস্য এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না।

ডানাওয়ালা মাছ

কতগুলি মাছের ডানা হয়। আর চামচিকার ন্যায় এদিক–সেদিক স্থলচর পাখীর মতোই ডানা মেলে উড়ে বেড়ায়।

কতগুলি মাছ অতি ক্ষুদ্র আর অসহায় ধরনের। এগুলি নদী–নালায় বেশী পরিমাণ জন্মে। এগুলির জন্যও আল্লাহ্ আত্মরক্ষার উপায় করে দিয়েছেন। কোন কোন মাছের দুই পাশে সূচালো আর বিষাক্ত কাঁটা রয়েছে, তাদের ধরতে গেলে তারা মানুষের শরীরে হঠাৎ কাঁটা ফুটিয়ে দেয়। এজন্য সহসা কেউ তাদের ধরতে যায় না। কুদরতের এসব রহস্য আর বৈচিত্র্য এতই রয়েছে যে, তা লিখে শেষ করা কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আমি এখানে যা সামান্য কিছু লিখলাম এটা আল্লাহ্র অফুরন্ত কুদরত আর হিকমতের প্রতি ইশারা মাত্র। এর প্রতি লক্ষ্য করলেই চিন্তা আর দৃষ্টির সামান্য বিকাশ ঘটে।

উদ্ভিদ সৃষ্টির রহস্য

আল্লাহ্ বলেনঃ

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهٖ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوْا شَجَرَهَا ءَاِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَّعْدِلُوْنَ ـ

সেই আল্লাহ্ যিনি আকাশমণ্ডলী আর জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য আসমান থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তদ্দ্বারা জঙ্গল সদৃশ বাগিচা সৃষ্টি করেন, যা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না, বলো! আল্লাহ্ ছাড়া আছে কি আর কোনো মা'বুদ? বরং তারা এমন কওম যাহারা সত্য হইতে বিচ্যুত। (সূরা নমলঃ আয়াত নং ৬০)

জমিনের প্রতি লক্ষ্য কর, কি শ্যামল সবুজ বাগ–বাগিচা। তাতে মানুষ আর পশু–পাখির জন্য রয়েছে কতো উপকারিতা আর রহস্য। এর উৎপত্তির ব্যবস্থা এভাবে করা হয়েছে যে, এর মূলে রয়েছে বীজ আর দানা। সেই বীজ আর দানার ভিতর উদ্ভিদের অংকুর এভাবে প্রচ্ছন্ন রয়েছে যা দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে খাদ্য শস্য আর ফুলের গাছ। আর রয়েছে তরি–তরকারী যা মানুষের নিত্য প্রয়োজন। এই উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে তৃণ আর পশুর আহার, এতে রয়েছে জ্বালানি আর ঘর দরজা তৈরীর কাঠ। জাহাজ আর নৌকা তৈরীর কাঠও পাওয়া যায় এ উদ্ভিদ থেকে; এর উপকারিতা আর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বর্ণনাতীত। সব উদ্ভিদের এক একটি অংশ–ফল–ফুল, শাখা–প্রশাখা, পত্র পল্লব এমনকি এর জড়–শিকড় পর্যন্ত কাজে লাগে। অবশ্যই খোদা কোনো কিছুই বৃথা সৃষ্টি করেন নি। এই উদ্ভিদ দিয়ে পাচন, মোদক আর নানা প্রকার আরক তৈরী হয়। উদ্ভিদ না হলে মানুষ বাঁচতেই পারতো না। ইহা না হলে শস্য–ফসল, জ্বালানি, ঘর–দরজা, ইমারত নৌকা, জাহাজ তৈরীর উপাদান জুটতো না। মোটকথা, মানব সভ্যতাই গড়ে উঠতো কিনা সন্দেহ। আল্লাহ্র কুদরত দেখ।

একটি দানা মাটিতে পুঁতে ফেল আর শত শত দানা তার বিনিময়ে লাভ কর। তার চেয়েও বেশী লাভ করতে পার। এটা আল্লাহ্‌র দান আর প্রাচুর্য। এর দ্বারা নিজের উপস্থিত প্রয়োজন মিটাও এবং ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে রাখ; এ যেন বাদশার ন্যায়। কোন স্থান আবাদ করার জন্য বাসিন্দাদের কিছু শস্য দানা দিয়ে দেয় এবং তা বুনে কেটে তাদের জীবিকা আর প্রয়োজন মিটাতে বলে। আল্লাহ্‌ও তেমনি তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। মানুষকে জমিনে বসবাস করতে দিয়েছেন, উদ্ভিদ সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে, ফল-ফুল দিচ্ছে। বীজ বুনে ফসল জন্মাচ্ছে আবার বুনছে। এই ধারা অব্যাহতভাবে চলছে। এভাবেই উদ্ভিদ জগত টিকে আছে। যদি তা না হতো তবে একবার জন্মেই শেষ হয়ে যেত। এতে রয়েছে আল্লাহ্‌র অসীম কুদরত আর হিকমতের নিদর্শন।

আবার উদ্ভিদের দানাগুলির সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য কর। তার গঠন দেখ। একটি আবরণের মধ্যে কি সুন্দর ও নির্মল ভাবে তা রক্ষিত। দানাভর্তি খোসা বা থলিটি বীজ পরিপক্ক না হওয়া পর্যন্ত সেগুলি সংরক্ষণ করে। যেমন প্রাণীর বাচ্চাদানী, বাচ্চা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত থলিটি তাকে সযত্নে রক্ষা করে থাকে।

দানাগুলি বিশেষ ধরনের সিলকার আবরণে আবৃত থাকে, যার শীর্ষদেশে সূচালো আর ধারালো আবরণ থাকে। যেন পাখীর হাত থেকে ভিতরের বীজ রক্ষা করার জন্যই এর সৃষ্টি। আল্লাহ্‌র কুদরত লক্ষ্য কর। তিনি উদ্ভিদের দানা পাখী প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করার কেমনভাবে ব্যবস্থা করেছেন। যদিও এই সকল বীজ পাখীরও আহার, কিন্তু মানুষের প্রয়োজন আগে।

উদ্ভিদও মানুষ ও পশু-পাখীর ন্যায় খাদ্যের মুখাপেক্ষী। তবে আল্লাহ্‌ উদ্ভিদকে চলাফেরার শক্তি দান করেন নি, যাতে সে নিজের খাদ্য খুঁজে নিতে পারে। এ কারণে তার শিকড় মাটির ভিতর প্রবেশ করে যাতে সে সর্বক্ষণ মাটি আর পানি লাভ করতে পারে। এভাবে শিকড়গুলি মাটি থেকে রস আহরণ করে শাখা-প্রশাখা ফল-ফুল পর্যন্ত পৌছে দেয়। জমিন যেন উদ্ভিদকে প্রতিপালন করার জন্য করুণাময়ী মায়ের স্থলবর্তী। শিকড়গুলি উদ্ভিদের মুখস্বরূপ, সে জমিন থেকে রস চুষে বৃক্ষের সারা দেহে পৌছায়, শিশু যেমন মাতৃস্তন্য থেকে দুধ চুষে শক্তি লাভ করে।

তোমরা তাঁবু খাটাতে নিশ্চয়ই দেখেছ। তার চারদিকে খুঁটি। আর রশি বাঁধা থাকে। যাতে এক দিকে ঝুঁকে না পড়ে আর পুরো তাঁবুটি সোজা থাকে। বৃক্ষের

অবস্থাটি তেমনি। তার শিকড় মাটির চারদিকে এমনভাবে ছড়ানো যে, যাতে গাছটি একদিক হেলে ঝুঁকে না পড়ে। এমন না হলে বড়ো বড়ো বৃক্ষগুলি কিভাবে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতো—বিশেষতঃ ঝড়ের প্রবল বাতাসে। এভাবে উদ্ভিদের ফুল রক্ষা করার মধ্যে রয়েছে স্রষ্টার অসীম হিকমত আর কুদরত। মানুষও এই সৃষ্টি থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে নিজের বিগ্ড়ে যাওয়া কাজকে ঠিক করে নিতে পারে। গাছের একটি পাতা লও, তার বিষয় গবেষণা কর। দেখতে পার তাতে চিকন আর মোটা তারের মত রয়েছে। কতক লম্বালম্বি আর কতক আড়া-আড়ি। যেন শিরার জাল বিছানো রয়েছে। মানুষের পক্ষে এমন একটি কাজ করার শক্তি কোথায়? একটি পাতার কারুকার্য তৈরী করতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন হবে এবং তাও নকল, আসল হবে না। এসব কুদরতেরই কাজ। তার একটি ইশারায় কোটি কোটি পাতা-পুষ্পে ফুটে উঠে। এতে নেই কোনো শিল্পীর প্রয়োজন, নেই কোনো হাতিয়ারের দরকার। আর জংগল, পাহাড়, ময়দান—কোথাও এই কারিগরি পুর্ণ পাতার অভাব নেই। আর এই নকশা শুধু পাতার সৌন্দর্যই বাড়ায় না, এটা পাতার বেঁচে থাকার জন্য কাজে লাগে। এই রঙের সাহায্যে পাতা রস আহরণ করে। যেমন মানুষ আর অন্যান্য প্রাণীর দেহে শিরা আর উপশিরা এক একটি জাল বিছানো রয়েছে। তা দেহের সর্বত্র খাদ্য পৌছাতে কাজে আসে।

পাতার মধ্যে যে মোটা শিরাগুলি পাতাটিকে ঘিরে রাখে ,তাতে পাতাটি নিজ গঠনে টিকে থাকে। নতুবা নরম আর হালকা হওয়ার কারণে পাতাটি বায়ু ঝাপ্টার টুকরো টুকরো হয়ে যেত।

এবার ফলের বিচি আর তার সৃষ্টিনৈপুণ্যের প্রতি লক্ষ্য কর। বিচিটি ফলের ভিতরে সংরক্ষিত থাকে। যদি কোন নৈসর্গিক আপদ বিপদে বৃক্ষটি নষ্ট হয়ে যায় তবে বিচিটিই গাছের স্থলবর্তী হয়। নতুন করে গাছটি লাগানো আর জন্মানোর ব্যবস্থা হয়। এই দিক থেকে হিসাব করলে ফলের বিচিটি ভারী মূল্যবান আর রক্ষণযোগ্য। যদিও বিচিটি প্রায়ই শক্ত হয়ে থাকে, তথাপি নরম ফলের মধ্যেও তা এঁটে সেঁটে থাকে। যদি তা না হতো তবে ফল পাকার আগেই তা নষ্ট হয়ে ফল নষ্ট করে দিত। কোনো ফলের বিচি উত্তম খাদ্য। কোনটি হতে তৈল বের করা হয়। আর তা খাদ্য ও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হয়। এতে রয়েছে অনেক স্বাদ আর উপকারিতা। এতে রয়েছে সৃষ্টিকর্তার অসীম নৈপুণ্যের পরিচয়।

এই বিচির মধ্যে যে প্রকৃতি আর গুণাগুণ আল্লাহ্ নিহিত রেখেছেন, যেমন মানুষের বীর্যতে মানব সৃষ্টির রহস্য নিহিত রয়েছে। এসব রহস্য আর হিকমত জানেন সেই আল্লাহ্, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন।

বিচির উপর একটা শক্ত আবরণ সৃষ্টি করার মধ্যে রয়েছে স্রষ্টার কৌশল আর নৈপুণ্য! কেননা বিচিটি কোথাও পড়ে গিয়ে সেই আবরণের খাতিরে নষ্ট হতে পারে না। যদি তা রেখে দেওয়া হয় তবুও তা নষ্ট হয়ে যায় না। বরং সেই আবরণ বা খোসার ফলে বিচিটি কিছুদিন টিকে থাকে। খোসাটি যেন একটি বাক্স যাতে মূলবান সামগ্রী রক্ষিত থাকে।

বিচি যখন জমিনে বপন করা হয় আর পানি সেচ করা হয় তখন তা ফেটে অংকুর বের হয়, কাণ্ড গজায়। যতই এটি বাড়তে থাকে ততই মাটির শিকড় ছাড়তে থাকে। এর ফলে গাছটি মাটির উপর টিকে যায়। তার এই শিকড়ের সাহায্যে বৃক্ষটি মাটি থেকে রস আহরণ করে। এভাবে মাটির রস গাছের শাখায়, প্রশাখায়, পাতায় ও ফুলে গিয়ে পৌঁছে। আর এটা বন্টন হয় খুব পরিমিত পরিমাণে। এতে লাভ করে সবাই প্রয়োজনীয় খাদ্য, যার জন্য যতটা খাদ্য প্রয়োজন আল্লাহ্ তাকে ততটুকুই পৌঁছাচ্ছেন। মাটির এ রস থেকে ফুলে আসে রং খুশবু, ফলে স্বাদ, মিষ্টতা এসবই আল্লাহ্র সৃষ্টির নৈপুণ্যে নিয়মিত বিধানেই পূর্ণতা লাভ করে।

ফল জন্মাবার পূর্বে শাখায় পাতা জন্মে। নতুন কোমল ফলগুলি রক্ষার জন্য পাতায় সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। যাতে প্রবল বাতাসে আর সূর্যের প্রখর তাপ থেকে কচি ফলগুলির রক্ষা পায়। গরম আর ঠাণ্ডা থেকে পাতার সাহায্যে ফলগুলি রক্ষা পায়। আবার শৈত্য, উষ্ণতা, বাতাস, রোদ সবই পাতা থেকে ফুলে পৌঁছে আর ফল পাকতে সাহায্য করে। ফলের পুষ্টি আর পরিপক্কতার জন্যও সব প্রয়োজন আর ফলগুলি পড়ে গেলে নষ্ট হওয়া থেকেও এসব প্রাকৃতিক জিনিসের প্রয়োজন।

দেখ; আল্লাহ্ বৃক্ষ, ফল আর ফুল কি চমৎকারভাবে বিন্যাস করেছেন। এদের ভিন্ন ভিন্ন রং, রকমারি গঠন আর আকৃতি, নানা প্রকার স্বাদ আর বিভিন্ন রকমের সুগন্ধ রয়েছে। কোনটা বড়, কোনটা ছোট, কোনটা মধ্যমাকৃতির, কোটা লাল, কোনটা সবুজ, কোনটা বা সাদা, কোনটা বা গাঢ় সবুজ আর কোনটা হালকা, কোনটা মাঝামাঝি। এই বিভিন্নতার হিসাবে এগুলির স্বাদ

মিঠা, কটা আবার কোনটা তিক্ত। আবার এগুলির ঘ্রাণ মধুর আর প্রাণ মাতানো। প্রতিটি ফল ও ফুলের গন্ধ আর ঘ্রাণ ভিন্ন ভিন্ন। এর বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে লিখেছি, যাতে একজন জ্ঞানী ব্যক্তির দৃষ্টি প্রসারিত হতে পারে। আর আল্লাহ্র কুদরতের প্রতি দৃঢ় আস্থা আসতে পারে। আর এসব দেখে শুনে অন্তরে অপার আনন্দ সৃষ্টি হয়। আল্লাহ্র সৃষ্ট উদ্ভিদরাজির শ্যামল সবুজ রূপ দেখে প্রাণ সজীব হয়ে উঠে আর এর ভিতরে যে রহস্য ও উপকারিতা নিহিত রয়েছে, তা গণনা করার সাধ্য কারো নেই। উদ্ভিদের ভিতর রয়েছে জীবনের উপাদান আর খাদ্যে এমন স্বাদ আর খুশ্বু যা মনকে উৎফুল্ল করে তোলে। উদ্ভিদের বিচি শুষ্ক হলে তা আবার বপন করা হয়। আর ফলে রেখেছেন আল্লাহ্ অপূর্ব স্বাদ আর উপকারিতা।

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ وَصِبْغٍ لِلْآكِلِينَ -

সে পানি দ্বারা আমি যয়তুন বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি যা সিনাই পাহাড়ে প্রচুর পাওয়া যায়, যা তেলসহ জন্মে আর আহরণকারীদের জন্য বাঞ্জন।

(সূরা মোমেনুন আয়াত নং ২০)

আল্লাহ্ পাথর আর পাথরের মধ্যে পরিশুদ্ধ সুস্বাদু যয়তুন তেল সৃষ্টি করেছেন। যেমন আল্লাহ্ গোবর আর ময়লার ভিতর পয়দা করেন সাদা পুষ্টিকর দুধ। আর মৌমাছির দ্বারা উৎপন্ন করান মধু যার রং বিভিন্ন হয়ে থাকে আর তাতে অপূর্ব স্বাদ ছাড়াও রয়েছে বহু রোগের প্রতিকার।

শিকড়ের সাহায্যে গাছের উঁচু শাখা পর্যন্ত পানি আর রস পৌঁছে—কুদরতের কি বিস্ময়কর ব্যাপার। আবার বৃক্ষের শাখা-প্রশাখায়, ফলে-ফুলে যেখানে যে পরিমাণে খাদ্য প্রয়োজন সেখানে সে পরিমাণে তাহাও পৌঁছে যায়। গাছের যে ডালে আনার রয়েছে তৎপ্রতি লক্ষ্য কর, যতদিন আনারটি পরিপক্ক না হয় ততদিন শাখা ফলটিকে ধরে রাখবে।

খেজুরের পুরুষ আর স্ত্রী জাতীয় বৃক্ষ রয়েছে। যেখানে দুই জাতীয় গাছ নেই সেখানে ফল জন্মাবে না। এটা আল্লাহ্‌র কুদরতের এক লীলা যে, তিনি প্রাণী জগতের ন্যায় উদ্ভিদ জগতেও স্ত্রী আর পুরুষ জাতীয় বৃক্ষ তৈরী করেছেন, যাতে আল্লাহ্‌র কুদরত আরো প্রকাশ পায়। এই উদ্ভিদের মধ্যে রয়েছে লতা–গুল্ম এবং তাতে রয়েছে অসীম উপকারিতা। এগুলির গুণাগুণ আর কার্যকারিতার প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র কুদরত দেখা যায়। প্রকাশ্যতঃ মনে হয় এগুলি বন জংগলের ঘাস–পাতা। যে পরিমাণ অংশ দরকার তা ঠিকভাবে সরবরাহ হয়।

খেজুর (খুরমা) দেখ! প্রথমে সেগুলি খুবই নাজুক থাকে। সেগুলি পরস্পর একটি ছড়ায় জড়িত থাকায় সংরক্ষিত থাকে। তার উপর একটি খোসা সৃষ্টি হয়। যখন খেজুর পরিপক্ক হয় তখন খোসা ফেটে যায়। এটাই হচ্ছে কুদরতের বিধান।

আনার দেখ! বিস্ময়কর কৌশলে দানাগুলি ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত। এর উপর হালকা পর্দার আবরণ রয়েছে। একটি পুরু অথচ নরম আবরণের মধ্যে দানাগুলি স্তরে স্তরে রক্ষিত, যাতে সবগুলি দানা একত্রে থেকে পরিপক্ক হতে পারে। আল্লাহ্ মানুষের উপকারের জন্যই এগুলির সৃষ্টি করেছেন। এটা একাধারে খাদ্য আবার রোগীর পথ্যও। আবার এগুলি সংরক্ষিত করে রাখার উপযোগী অমূল্য ঔষধের সমষ্টি। কোনটা জুলাপ, কোনটা পিত্তরোধক, কোনটা বায়ুনাশক, কোনটা শান্তিদায়ক, কোনটা পাচক, কোনটা বা রোধক, কোনটা বা ভেদক, দেখ! আল্লাহ্ এদের মধ্যে কত রহস্য নিহিত রেখেছেন। এ সবই মানুষের উপকারের জন্য।

অন্তরে আল্লাহ্‌র মাহাত্ম্য সৃষ্টি

আল্লাহ্ বলেনঃ

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لَّا تَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا۔

সপ্ত আসমান ও জমিন আর তাতে যা কিছু আছে সকলেই তাঁহার পবিত্রতা বর্ণনা করিতেছে। আর কোন বস্তু নাই যাহা আল্লাহ্‌র তসবীহ পাঠ না করে কিন্তু তোমরা উহা বুঝ না। তিনি অতি বড় ধৈর্যশীল আর দয়ালু।

(সূরা বনি ইসরাইলঃ আয়াত নং–৪৫)

وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهٖ وَالْمَلٰٓئِكَةُ مِنْ خِيْفَتِهٖ۔

রা'দ (ফেরেশ্‌তা) আল্লাহ্‌র প্রশংসা সহকারে তাহার গুণগান করেন আর অন্যান্য ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহর প্রশংসা করে থাকে।

(সূরা রাআদঃ আয়াত নং ১৩–এর অংশ)

আল্লাহ্ আরও বলেনঃ

تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلٰٓئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ۔

আশ্চর্য নহে আসমান উপর থেকে বিদীর্ণ হয়ে যায় আর ফেরেশ্‌তাগণ আল্লাহ্‌র প্রশংসায় গুণগান করে পরে জমিনের বাসিন্দাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। (সূরা শুআরাঃ আয়াত নং–৫)

পূর্বে যা কিছু আল্লাহ্‌র বিস্ময়কর কৌশল ও কুদরতের কথা বর্ণনা করা হলো, এ দ্বারা আল্লাহ্‌র অপার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। এভাবে

যদি তুমি নিজের বিষয় চিন্তা কর তবে তেমনি আল্লাহ্‌র মহাকুদরত ও কৌশল দেখতে পাবে। তোমাদের বসতিস্থল এই পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য কর, তাতেও অসংখ্য কুদরত আর হিকমত দেখতে পাবে। উঁচু পাহাড়, উঁচু টিলা, প্রশস্ত মাঠ, প্রবাহিত নদী, অকুল সমুদ্র প্রভৃতি। সমুদ্রের বিস্ময়, স্থলভাগের বৃক্ষরাজি আর পর্বতমালার প্রতি লক্ষ্য কর, চতুষ্পদ পশু, নভোচর পাখী প্রভৃতির বিষয় লক্ষ্য কর, এতে দৃষ্টিবান লোকদের জন্য রয়েছে শিক্ষা আর উপদেশ। এসব সৃষ্টির কৌশল আর নৈপুণ্য আর তার উপকারিতা শুমার করা অসম্ভব। বিশাল আসমানের তুলনায় এই পৃথিবী একটি বিন্দুর ন্যায়। অনুমান করো আকাশ, তার নক্ষত্র আর তার বিস্তার। সূর্য আকাশের তারকামণ্ডলীর মধ্যে একটি উজ্জ্বল আর উষ্ণ তারকা। আকাশের তারকামণ্ডলী সম্পর্কে গবেষণাকারী বৈজ্ঞানিকগণের মতে সূর্য পৃথিবীর তুলনায় একশ' ষাট গুণ বড় (বর্তমানে গবেষণাকারিগণের হিসাবে চৌদ্দ লক্ষ গুণ বড়)। অন্যান্য বহু তারকা পৃথিবী অপেক্ষা শত শত গুণ বড়। আবার দেখ চাঁদ–সূর্য ও অন্যান্য অগণিত নক্ষত্র যা আকাশমার্গে বিক্ষিপ্ত রয়েছে আর সারা আকাশই তাতে পরিপূর্ণ দেখা যায়, এরা সংখ্যায় কোটি কোটি আকাশে বিদ্যমান রয়েছে। এতে অনুভব করতে পার আকাশের দৈর্ঘ–প্রস্থ কতখানি, আবার এত বড়ো বড়ো নক্ষত্রগুলি তোমার চোখে একটি ক্ষুদ্র প্রদীপের মতো দেখা যায়। কাজেই তা কতো উর্ধ্বে আর কতো দূরে তা ভেবে দেখ। তোমরা তাদের গতিবিধি দেখতে পাও না, এমনি আসমান ও গতিশীল তারার গতি বা আবর্তন আমরা অনুভব করতে পারি না। এগুলি মানুষের জ্ঞান সীমার বাইরে। অধিকাশ লোকই এ বিষয়ে উদাসীন ও অমনোযোগী। এগুলির বিশালতা আর বিরাটত্বের প্রতি লক্ষ্য করে আল্লাহ্‌র কুরআনী কসম শ্রবণ করো।

আল্লাহ্ বলেনঃ

وَالسَّمَآءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ -

কসম কক্ষ বিশিষ্ট আসমানের। (সূরা বুরুজঃ আয়াত নং–১)

وَالسَّمَآءِ وَالطَّارِقِ - وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ -

কসম আসমানের আর সেই জিনিসের, যা রাত্রে উদিত হয়, জান তা কি, যা রাত্রে উদিত হয়। তা হচ্ছে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র।

(সূরা তারেকঃ আয়াত নং–১২৩)

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ - وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ -

আমি কসম করছি নক্ষত্রগুলির অস্তমিত হওয়ার, আর তোমরা যদি চিন্তা কর তবে এটা ভারী কসম।' (সূরা ওয়াক্বেয়াঃ আয়াত নং ৮৫–৮৬)

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ -

তাঁর কুরসী, আসমান আর ভূ–মণ্ডলকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে।

(সূরা বাকারাঃ আয়াত নং–২৫৫–এর অংশ)

এর বিরাটত্ব আর বিশালতা আর এই সৃষ্টির ব্যাপকতা অনুমান আর চিন্তা দ্বারা সেই মহাশক্তিমান মহামর্যাদার অধিকারী সৃষ্টিকর্তার কথা চিন্তা কর।